কমলাকান্তের দপ্তর + কমলাকান্তের পত্র + কমলাকান্তের জোবানবন্দী

একটি বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books) পরিবেশনা।

কমলাকান্তের দপ্তর

+

কমলাকান্তের পত্র

+

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কমলাকান্তের
দপ্তর

০১. একা “কে গায় ওই”

বহুকাল বিস্মৃত সুখস্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় ঐ মধুর গীতি কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। এত মধুর লাগিল কেন? এই সংগীত যে অতি সুন্দর, এমত নহে। পথিক পথ দিয়া, আপন মনে গায়িতে গায়িতে যাইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি দেখিয়া, তাহার মনের আনন্দ উছলিয়া উঠিয়াছে। স্বভাবতঃ তাহার কন্ঠ মধুর;- মধুর কন্ঠে, এই মধুমাসে, আপনার মনের সুখের মাধুর্য্য বিকীর্ণ করিতে করিতে যাইতেছে। তবে বহুতন্ত্রীবিশিষ্ট বাদ্যের তন্ত্রীতে অঙ্গুলিস্পর্শের ন্যায়, ঐ গীতিধ্বনি আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিল কেন?

কেন, কে বলিবে? রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী –নদী–সৈকতে কৌমুদী হাসিতেছে। অর্দ্ধাবৃতা সুন্দরীর নীল বসনের ন্যায় শীর্ণ–শরীরা নীল–সলিলা তরঙ্গিণী, সৈকত বেষ্টিত করিয়া চলিয়াছেন; রাজপথে কেবল আনন্দ–বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা, বিমল চন্দ্রকিরণে স্নাত হইয়া আনন্দ করিতেছে। আমিই কেবল নিরানন্দ–তাই ঐ সঙ্গীতে আমার হৃদয়যন্ত্র বাজিয়া উঠিল।

আমি একা –তাই এই সংগীত আমার শরীর কন্টকিত হইল। এই বহুজনাকীর্ণ নগরী–মধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোতোমধ্যে মিশিয়া, এই বিশাল আনন্দতরঙ্গ–তাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?

তাহা জানি না–কেবল ইহাই জানি যে, আমি একা। কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা। পুষ্প সুগন্ধি, কিন্তু যদি ঘ্রাণগ্রহণকর্ত্তা না থাকিত, তবে পুষ্প সুগন্ধি হইত না–ঘ্রাণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট না থাকিলে গন্ধ নাই। পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়–কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

কিন্তু বারেক মাত্র শ্রুত ঐ সংগীত আমার কেন এত মধুর লাগিল, তাহা বলি নাই। অনেক দিন আনন্দোত্থিত সংগীত শুনি নাই–অনেক দিন আনন্দানুভব করি নাই। যৌবনে, যখন পৃথিবী সুন্দরী ছিল, যখন প্রতি পুষ্পে সুগন্ধ পাইতাম, প্রতি পত্রমর্ম্মরে মধুর শব্দ শুনিতাম, প্রতি নক্ষত্রে চিত্রা রোহিণীর শোভা দেখিতাম, প্রতি মনুষ্যমুখে সরলতা দেখিতাম, তখন আনন্দ ছিল। পৃথিবী এখনও তাই আছে, সংসার এখনও তাই আছে, মনুষ্য চরিত্র এখনও তাই আছে। কিন্তু এ হৃদয় আর তাই নাই। তখন সংগীত শুনিয়া আনন্দ হইত। আজি এই সংগীত শুনিয়া সেই আনন্দ মনে পড়িল। যে অবস্থায়, যে সুখে সেই আনন্দ অনুভূত করিতাম, সেই অবস্থা, সেই সুখ মনে পড়িল। মুহূর্ত্তের জন্য আবার যৌবন ফিরিয়া পাইলাম। আবার তেমনি করিয়া, মনে মনে, সমবেত বন্ধুমণ্ডলীমধ্যে বসিলাম; আবার সেই অকারণসঞ্জাত উচ্চ হাসি হাসিলাম, যে কথা নিষ্প্রয়োজনীয় বলিয়া এখন বলি না, নিষ্প্রয়োজনেও চিত্তের চাঞ্চল্য হেতু তখন বলিতাম, আবার সেই সকল বলিতে লাগিলাম; আবার অকৃত্রিম হৃদয়ে পরের প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে মনে গ্রহণ করিলাম। ক্ষণিক ভ্রান্তি জন্মিল–তাই এ সংগীত এত মধুর লাগিল। শুধু তাই নয়। তখন সংগীত ভাল লাগিত,-এখন লাগে না–চিত্তের যে প্রফুল্লতার জন্য ভাল লাগিত, সে প্রফুল্লতা নাই বলিয়া ভাল লাগে না। আমি মনের ভিতর মন লুকাইয়া সেই গত যৌবনসুখ চিন্তা করিতেছিলাম–সেই সময়ে এই পূর্ব্বস্মৃতিসূচক সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিল, তাই এত মধুর বোধ হইল।

সে প্রফুল্লতা, সে সুখ, আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জ্জন এবং ক্ষতি উভয়েই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জ্জন অধিক, ইহাও নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্ত্তি কমে কেন? পৃথিবী আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে, ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র। এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে, কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কন্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য -হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে, বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।- কিন্তু কি বলিতেছিলাম, ভুলিয়া গেলাম। সেই গীতধ্বনি! উহা ভাল লাগিয়াছিল বটে, কিন্তু আর দ্বিতীয় বার শুনিতে চাহি না। উহা যেমন মনুষ্যকন্ঠ-জাত সংগীত, তেমনি সংসারের এক সংগীত আছে। সংসাররসে রসিকেরাই তাহা শুনিতে পায়। সেই সংগীত শুনিবার জন্য আমার চিত্ত আকুল। সে সংগীত আর কি শুনিব না? শুনিব, কিন্তু নানাবাদ্যধ্বনিসংমিলিত বহুকন্ঠপ্রসূত সেই পূর্ব্বশ্রুত সংসারগীত আর শুনিব না। সে গায়কেরা আর নেই -সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্ব্বব্যাপিনী -ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার-সংগীত। অনন্ত কাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়-তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

০২. মনুষ্য ফল

আফিমের একটু বেশী মাত্রা চড়াইলে আমার বোধ হয়, মনুষ্যসকল ফলবিশেষ-মায়াবৃন্তে সংসার-বৃক্ষে ঝুলিয়া রহিয়াছে, পাকিলেই পড়িয়া যাইবে। সকলগুলি পাকিতে পায় না -কতক অকালে ঝড়ে পড়িয়া যায়। কোনটি পোকায় খায়, কোনটিকে পাখীতে ঠোকরায়। কোনটি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে। কোনটি সুপক্ক হইয়া, আহরিত হইলে গঙ্গাজলে ধৌত হইয়া দেবসেবায় বা ব্রাহ্মণভোজনে লাগে -তাহাদিগেরই ফলজন্ম বা মনুষ্যজন্ম সার্থক। কোনটি সুপক্ক হইয়া, বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়িয়া মাটিতে পড়িয়া থাকে, শৃগালে খায়। তাহাদিগের মনুষ্যজন্ম বা ফলজন্ম বৃথা। কতকগুলি তিক্ত, কটু বা কষায়-কিন্তু তাহাতে অমূল্য ঔষধ প্রস্তুত হয়। কতকগুলি বিষময়-যে খায়, সেই মরে। আর কতকগুলি মাকাল জাতীয়-কেবল দেখিতে সুন্দর।

কখন কখন ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিতে পাই যে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ সম্প্রদায়ের মনুষ্য পৃথক জাতীয় ফল। আমাদের দেশের এক্ষণকার বড়মানুষদিগের মনুষ্যজাতিমধ্যে কাঁটাল বলিয়া বোধ হয়। কতকগুলি খাসা খাজা কাঁটাল, কতকগুলির বড় আটা, কতকগুলি কেবল ভুতুড়িসার, গরুর খাদ্য। কতকগুলি ইঁচোড়ে পাকে, কতকগুলি কেবল ইঁচোড়েই থাকে, কখন পাকে না। কতকগুলি পাকিলে পাকিতে পারে, কিন্তু পাকিতে পায় না, পৃথিবীর রাক্ষস-রাক্ষসীরা ইঁচোড়েই পাড়িয়া দালনা রাঁধিয়া খাইয়া ফেলে। যদি পাকিল ত বড় শৃগালের দৌরাত্ম্য। যদি গাছ ঘেরা থাকে ত ভালই। যদি কাঁটাল উঁচু ডালে ফলিয়া থাকে, ভালই; নহিলে শৃগালেরা কোনমতে উদরসাৎ করিবে। শৃগালেরা কেহ দেওয়ান, কেহ কারকুন, কেহ নাএব, কেহ গোমস্তা, কেহ মোছায়েব, কেহ কেবল আশীর্ব্বাদক। যদি এ সকলের হাত এড়াইয়া, পাকা কাঁটাল ঘরে গেল, তবে মাছি ভন্‌ ভন্‌ করিতে আরম্ভ করিল। মাছিরা কাঁটাল চায় না, তাহারা কেবল একটু একটু রসের প্রত্যাশাপন্ন। এ মাছিটি কন্যাভারগ্রস্ত, উহাকে এক ফোঁটা রস দাও,-ওটির মাতৃদায়, একটু রস দাও। এটি একখানি পুস্তক লিখিয়াছে, একটু রস দাও,-সেটি পেটের দায়ে একখানি সম্বাদ-পত্র করিয়াছে, উহাকেও একটু রস দাও। এ মাছিটি কাঁটালের পিসীর ভাশুর-পুত্রের শ্যালার শ্যালীপুত্র-খাইতে পায় না, কিছু রস দাও। সে মাছিটির টোলে পৌনে চৌদ্দটি ছাত্র পড়ে, কিছু রস দাও। আবার এদিকে কাঁটাল ঘরে রাখাও ভাল না-পচিয়া দুর্গন্ধ হইয়া উঠে। আমার বিবেচনায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া, উত্তম নির্জ্জল দুগ্ধের ক্ষীর প্রস্তুত করিয়া, কমলাকান্তের ন্যায় সুব্রাহ্মণকে ভোজন করানই ভাল।

এ দেশের সিবিল সার্ব্বিসের সাহেবদিগকে আমি মনুষ্যজাতিমধ্যে আম্রফল মনে করি। এ দেশে আম ছিল না, সাগরপার হইতে কোন মহাত্মা এই উপাদেয় ফল এ দেশে আনিয়াছেন। আম্র দেখিতে রাঙ্গা, রাঙ্গা, ঝাঁকা আলো করিয়া বসে। কাঁচায় বড় টক-পাকিলে সুমিষ্ট বটে, কিন্তু তবু হাড়ে টক যায় না। কতকগুলো আম এমন কদর্য্য যে, পাকিলেও টক যায় না। কিন্তু দেখিতে বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা হয়, বিক্রেতা ফাঁকি দিয়া পঁচিশ টাকা শ' বিক্রয় করিয়া যায়। কতকগুলি আম কাঁচামিটে আছে -পাকিলে পানশে। কতকগুলো জাঁতে পাকা। সেগুলি কুটিয়া নুন মাখিয়া আমসী করাই ভাল।

সকলে আম্র খাইতে জানে না। সদ্য গাছ হইতে পাড়িয়া এ ফল খাইতে নাই। ইহা কিয়ৎক্ষণ সেলাম-জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা করিও-যদি জোটে, তবে সেই জলে একটু খোশামোদ-বরফ দিও-বড় শীতল হইবে। তার পরে ছুরি চালাইয়া স্বচ্ছন্দে খাইতে পার।

স্ত্রীলোকদিগকে লৌকিক কথায় কলাগাছের সহিত তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু সে গেছো কথা। কদলীফলের সঙ্গে ভুবনমোহিনী জাতির আমি সৌসাদৃশ্য দেখি না। স্ত্রীলোক কি কাঁদি কাঁদি ফলে? যাহার ভাগ্যে ফলে ফলুক-কমলাকান্তের ভাগ্যে ত নয়। কদলীর সঙ্গে কামিনী-গণের এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য আছে যে, উভয়েই বানরের প্রিয়। কামিনীগণের এ গুণ থাকিলেও কদলীর সঙ্গে তাঁহাদিগের তুলনা করিতে পারি না। পক্ষান্তরে কতকগুলি কটুভাষী আছেন, তাঁহারা ফলের মধ্যে মাকাল ফলকেই যুবতীগণের অনুরূপ বলেন। যে বলে, সে দুর্ম্মুখ- আমি ইঁহাদিগের ভৃত্যস্বরূপ; আমি তাহা বলিব না। আমি বলি, রমণীমণ্ডলী এ সংসারের নারিকেল। নারিকেলও কাঁদি কাঁদি ফলে বটে, কিন্তু (ব্যবসায়ী নহিলে) কেহ কখন কাঁদি কাঁদি পাড়ে না। কেহ কখন দ্বাদশীর পারণার অনুরোধে, অথবা বৈশাখ মাসে ব্রাহ্মণসেবার জন্য একটি আধটি পাড়ে। কাঁদি কাঁদি পাড়িয়া খাওয়ার অপরাধে যদি কেহ অপরাধী থাকে, তবে সে কুলীন ব্রাহ্মণেরা। কমলাকান্ত কখন সে অপরাধে অপরাধী নহে।

বৃক্ষের নারিকেলের ন্যায় সংসারের নারিকেলের বয়োভেদে নানাবস্থা। করকচি বেলা উভয়েই বড় স্নিগ্ধকর -নারিকেলের জলে স্নিগ্ধ হয়-কিশোরীর অকৃত্রিম বিলাস-লক্ষণ-শূন্য প্রণয়ে হৃদয় স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু দুই জাতীয়,-ফলজাতীয় এবং মনুষ্যজাতীয়, নারিকেলের ডাবই ভাল। তখন দেখিতে কেমন উজ্জ্বল শ্যাম -কেমন জ্যোতির্ম্ময়, রৌদ্র তাহা হইতে প্রতিহত হইতেছে-যেন সে নবীন শ্যাম শোভায় জগতের রৌদ্র শীতল হইতেছে। গাছের উপর কাঁদি কাঁদি নারিকেল, আর গবাক্ষপথে কাঁদি কাঁদি যুবতী, আমার চক্ষে একই দেখায় -উভয়ই চতুর্দ্দিক আলো করিয়া থাকে। কিন্তু দেখ-দেখিয়া ভুলিও না -এই চৈত্র মাসের রৌদ্র, গাছ হইতে পাড়িয়া ডাব কাটিও না-বড় তপ্ত। সংসারশিক্ষাশূন্য কামিনীকে সহসা হৃদয়ে গ্রহণ করিও না-তোমার কলিজা পুড়িয়া যাইবে। আম্রের ন্যায়, ডাবকেও বরফ-জলে রাখিয়া শীতল করিও-বরফ না জোটে, পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখিয়া ঠাণ্ডা করিও-মিষ্ট কথায় না করিতে পার, কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর আজ্ঞা, কড়া কথায় করিও।

নারিকেলের চারিটি সামগ্রী -জল, শস্য, মালা আর ছোবড়া। নারিকেলের জলের সঙ্গে স্ত্রীলোকের স্নেহের আমি সাদৃশ্য দেখি। উভয়ই বড় স্নিগ্ধকর। যখন তুমি সংসারের রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম কামনা কর, তখন এই শীতল জল পান করিও-সকল যন্ত্রণা ভুলিবে। তোমার দারিদ্র-চৈত্রে বা বন্ধুবিয়োগ-বৈশাখে-তোমার যৌবন-মধ্যাহ্নে বা রোগতপ্ত-বৈকালে, আর কিসে তোমার হৃদয় শীতল হইবে? মাতার আদর, স্ত্রীর প্রেম, কন্যার ভক্তি, ইহার অপেক্ষা জীবনের সন্তাপে আর কি সুখের আছে? গ্রীষ্মের তাপে ডাবের জলের মত আর কি আছে? তবে, ঝুনো হইলে জল একটু ঝাল হইয়া যায়। রামার মা ঝুনো হইলে পর, রামার বাপ ঝালের চোটে বাড়ী ছাড়িয়াছিল। এই জন্য নারিকেলের মধ্যে ডাবেরই আদর।

নারিকেলের শস্য, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি। করকচি বেলায় বড় থাকে না; ডাবের অবস্থায় বড় সুমিষ্ট, বড় কোমল; ঝুনোর বেলায় বড় কঠিন, দন্তস্ফুট করে কার সাধ্য? তখন ইহাকে গৃহিণীপনা বলে। গৃহিণীপনা রসাল বটে, কিন্তু দাঁত বসে না। এক দিকে কন্যা বসিয়া আছেন, মায়ের অলঙ্কারের বাক্স হইতে কিয়দংশ সংগ্রহ করিবেন,-কিন্তু ঝুনোর শস্য এমনি কঠিন যে, মেয়ের দাঁত বসিল না-ঝুনো দয়া করিয়া একটি মাকড়ি বাহির করিয়া দিল। হয়ত পুত্র বসিয়া আছেন, মায়ের নগদ পুঁজির উপর দাঁত বসাইবেন,-ঝুনো দয়া করিয়া নগদ সাত সিকা বাহির করিয়া দিল। স্বামী প্রাচীন বয়সে একটি ব্যবসায় ফাঁদিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু শেষ বয়সে হাত খালি-টাকা নহিলে ব্যবসায় হয় না-

ঝুনোর পুঁজির উপর দৃষ্টি। দুই চারিটি প্রবৃত্তিরূপ দন্ত ফুটাইয়া দিলেন-বুড়া বয়সের দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। শেষ যদি দাঁত বসিল, নারিকেল জীর্ণ করিবার সাধ্য কি? যত দিন না টাকা ফিরাইয়া দেন, তত দিন অজীর্ণ রোগে রাত্রে নিদ্রা হয় না।

তার পরে মালা-এটি স্ত্রীলোকের বিদ্যা-কখন আধখানা বৈ পুরা দেখিতে পারিলাম না। নারিকেলের মালা বড় কাজে লাগে না; স্ত্রীলোকের বিদ্যাও বড় নয়। মেরি সমরবিল বিজ্ঞান লিখিয়াছেন জেন্ অষ্টেন্ বা জর্জ এলিয়ট উপন্যাস লিখিয়াছেন- মন্দ হয় নাই, কিন্তু দুই মালার মাপে।

ছোবড়া স্ত্রীলোকের রূপ। ছোবড়া যেমন নারিকেলের বাহ্যিক অংশ, রূপও স্ত্রীলোকের বাহ্যিক অংশ। দুই বড় অসার;- পরিত্যাগ করাই ভাল। তবে ছোবড়ায় একটি কাজ হয়- উত্তম রজ্জু প্রস্তুত হয়, তাহাতে জাহাজ বাঁধা যায়। স্ত্রীলোকের রূপের কাছিতেও অনেক জাহাজ বাঁধা গিয়াছে। তোমরা যেমন নারিকেলের কাছিতে জগন্নাথের রথ টান, স্ত্রীলোকেরা রূপের কাছিতে কত ভারি ভারি মনোরথ টানে। যখন রথ-টানা বারণের আইন হইবে,- তখন তাহাতে এ রথ-টানা নিষেধের জন্য যেন একটা ধারা থাকে-তাহা হইলে অনেক নরহত্যা নিবারণ হইবে। আমি জানি না, নারিকেলের রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কেহ কখন প্রাণত্যাগ করিয়াছে কি না, কিন্তু রমণীর রূপ রজ্জু গলায় বাঁধিয়া কত লোক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, কে তাহার গণনা করিবে?

বৃক্ষের নারিকেল এবং সংসারের নারিকেলের সঙ্গে আমার বিবাদ এই যে, আমি হতভাগা দুইয়ের এককেও আহরণ করিতে পারিলাম না। অন্য ফল আকর্ষী দিয়া পাড়া যায়, কিন্তু নারিকেল গাছে না উঠিলে পাড়া যায় না। গাছে উঠিতে গেলেও হয় নিজের পায়ে দড়ি বাঁধিতে হইবে, না হয় ডোমের খোশামোদ করিতে হইবে।1

ডোমের খোশামোদ করিতেও রাজি আছি। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষ কপালে নারিকেল জোটে না। আমি যেমন মানুষ, তেমনি গাছে তেমনি রূপগুণের আকর্ষী দিয়া নারিকেল পাড়িতে পারি। পারি, কিন্তু ভয়-পাছে নারিকেল ঘাড়ে পড়ে। এমন অনেক শ্যামী, বামী, রামী, কামিনী আছে যে, কমলাকান্তকেও স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পরের মেয়ে ঘাড়ে করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাএহ করিতে, এ দীন অসমর্থ। অতএব, এ যাত্রা, কমলাকান্ত ভক্তিভাবে, নারিকেল ফলটি বিশ্বেশ্বরকে দিলেন। তিনি একে শ্মশানবাসী, তাহাতে আবার বিষপান করিয়াছেন-ছাই ডাব নারিকেলে তাঁহার কি করিবে?

এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমুল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা - বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে। কিন্তু আমার চক্ষে নেড়া গাছে অত রাঙ্গা ভাল দেখায় না। একটু একটু পাতা ঢাকা থাকিলে ভাল দেখাইত; পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সেই সুন্দর। ফুলে গন্ধ মাত্র নাই-কোমলতা নাই, কিন্তু তবু ফুল বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা। যদি ফুল ঘুচিয়া ফল ধরিল, তখন মনে করিলাম, এইবার কিছু লাভ হইবে। কিন্তু তাহা বড় ঘটে না। কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে; তাহার ভিতর হইতে খানিক তূলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে!

অধ্যাপক ব্রাহ্মণগণ সংসারের ধুতূরা ফল। বড় বড় লম্বা লম্বা সমাসে, বড় বড় বচনে, তাঁহাদিগের অতি সুদীর্ঘ কুসুম সকল প্রস্ফুটিত হয়, ফলের বেলা কন্টকময় ধুতূরা। আমি অনেক দিন হইতে

মানস করিয়াছি যে, কুক্কুটমাংস ভোজন করিয়া হিন্দুজন্ম পবিত্র করিব -কিন্তু এই অধম ধুতূরাগুলার কাঁটার জ্বালায় পারিলাম না। গুণের মধ্যে এই যে, এই ধুতূরায় মাদকের মাদকতা বৃদ্ধি করে। যে গাঁজাখোরের গাঁজায় নেশা হয় না, তাহার গাঁজার সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি সাজিয়া দেয় -যে সিদ্ধিখোরের সিদ্ধিতে নেশা না হয়, তাহার সিদ্ধির সঙ্গে দুইটা ধুতূরার বীচি বাটিয়া দেয়। বোধ হয়, এই হিসাবেই বঙ্গীয় লেখকেরা আপনাপন প্রবন্ধমধ্যে অধ্যাপকদিগের নিকট দুই-চারিটা বচন লইয়া গাঁথিয়া দেন। প্রবন্ধ-গাঁজার মধ্যে সেই বচন-ধুতূরার বীচিতে পাঠকের নেশা জমাইয়া তুলে। এই নেশায় বঙ্গদেশ আজি কালি মাতিয়া উঠিয়াছে।

আমাদের দেশের লেখকদিগকে আমি তেঁতুল বলিয়া গণি। নিজের সম্পত্তি খোলা আর সিটে, কিন্তু দুগ্ধকেও স্পর্শ করিলে দধি করিয়া তোলেন। গুণের মধ্যে কেবল অম্লগুণ -তাও নিকৃষ্ট অম্ল। তবে এক গুণ মানি-ইহারা সাক্ষাৎ কাষ্ঠাবতার। তেঁতুল কাঠ নীরস বটে, কিন্তু সমালোচনার আগুনে পোড়েন ভাল। সত্য কথা বলিতে কি, তেঁতুলের মত কুসামগ্রী আমি সংসারে দেখিতে পাই না। যেই কিয়ৎপরিমাণে খায় তাহারই অজীর্ণ হয়, সেই অম্ল উদ্গার করে। যে অধিক পরিমাণে খায়, সেই অম্লপিত্তরোগে চিররুগ্ন। যাঁহারা সাহেব হইয়াছেন, টেবিলে বসিয়া, গ্যাসের আলোতে, বা আর্গাণ্ড জ্বালিয়া ফয়জু খানসামার হাতের পাক, কাঁটা চামচে ধরিয়া খাইতে শিখিয়াছেন,- তাঁহারা এক দায় এড়াইয়াছেন-তেঁতুলের অম্লের বড় ধার ধারিতে হয় না- আগাগোড়া তেঁতুলের মাছ দিয়া ভাত মারিতে হয় না। কিন্তু যাহাদিগকে চালা-ঘরে বসিয়া, মুঙ্গেরে পাতর কোলে করিয়া, পদী পিসীর রান্না খাইতে হয়, তাঁহাদের কি যন্ত্রণা! পদী পিসী কুলীনের মেয়ে, প্রাতঃস্নান করে, নামাবলী গায়ে দেয়, হাতে তুলসীর মালা, কিন্তু রাঁধিবার বেলা কলাইয়ের দাল, আর তেঁতুলের মাছ ছাড়া আর কিছুই রাঁধিতে জানেন না। ফয়জু জাতিতে নেড়ে, কিন্তু রাঁধে অমৃত।

আর একটি মনুষ্যফলের কথা বলা হইলেই অদ্য ক্ষান্ত হই। দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব ইহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহারা উঁচুতে ফলিলেন -নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান। যেখানে ইচ্ছা, সেখানে তুলিয়া দাও, একটু ঝড় বাতাসেই লতা ছিঁড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি। অনেকগুলি রূপেও কুষ্মাণ্ড, গুণেও কুষ্মাণ্ড।-তবে কুষ্মাণ্ড এখন দুই প্রকার হইতেছে-দেশী কুমড়া ও বিলাতী কুমড়া। বিলাতী কুমড়া বলিলে এমত বুঝায় না যে, এই কুমড়াগুলি বিলাত হইতে আসিয়াছে। যেমন দেশী মুচির তৈয়ারি জুতাকে ইংরেজি জুতা বলে, ইঁহারাও সেইরূপ বিলাতী। বিলাতী কুমড়ার যে গৌরব অধিক, ইহা বলা বাহুল্য।

সংসারোদ্যানে আরও অনেক ফল ফলে, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য, কদর্য্য, টক-

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

----

1 কমলাকান্ত বোধ হয়, পুরোহিতকে ডোম বলিতেছে; কেন না, পুরোহিতেই বিবাহ দেয়। উঃ কি পাষণ্ড! -ভীষ্মদেব।

০৩. ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন

বেন্থাম হিতবাদ দর্শনের সৃষ্টি করিয়া ইউরোপে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।
আমি এই হিতবাদমতে অমত করি না; বরং আমি ইহার অনুমোদক, তবে আপনারা জানেন কি না, বলিতে পারি না, আমি একজন সুযোগ্য দার্শনিক। আমি এই হিতবাদ দর্শন অবলম্বন করিয়া, কিছু ভাঙ্গিয়া, কিছু গড়িয়া, একটি নূতন দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে, তাহা বাঙ্গালায় প্রচলিত হিতবাদ দর্শনের নূতন ব্যাখ্যা মাত্র। তাহার স্থূল মর্ম্ম আমি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করিতেছি। প্রাচীন প্রথানুসারে দর্শনটি সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছে। এবং আমি স্বয়ংই সূত্রের ভাষ্য করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়াছি। বাঙ্গালাতেই সূত্রগুলি লিখিত হইয়াছে। আমি যে অসংস্কৃতজ্ঞ, এমত কেহ মনে করিবেন না। তবে সংস্কৃতে সূত্রগুলি কয়জন বুঝিতে পারিবে? অতএব, সাধারণ পাঠকের প্রতি অনুকূল হইয়া বাঙ্গালাতেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছি। সে সূত্রগ্রন্থের সারাংশ এইঃ
১। জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বরবিশেষকে উদর বলে।
ভাষ্য।– "বৃহৎ"- অর্থাৎ নাসিকা কর্ণাদি ক্ষুদ্র গহ্বরকে উদর বলা যায় না। বলিলে বিশেষ প্রত্যবায় আছে।
"জীবশরীরস্থ বৃহৎ গহ্বর"- জীবশরীরস্থ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, নহিলে পর্ব্বতগুহা প্রভৃতিকে উদর বলিয়া পরিচয় দিয়া কেহ তাহার পূর্ত্তির প্রত্যাশা করিতে পারেন।
"গহ্বর"- যদিও জীবশরীরস্থ গহ্বরবিশেষই উদর শব্দে বাচ্য, তথাপি অবস্থাবিশেষে অঞ্জলি প্রভৃতিও উদরমধ্যে গণ্য। কোন স্থানে উদর পুরাইতে হয়, কোন স্থানে অঞ্জলি পুরাইতে হয়।
২। উদরের ত্রিবিধ পূর্ত্তিই পরম পুরুষার্থ।
ভাষ্য।– সাংখ্যেরও এই মত। আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ উদর-পূর্ত্তি।
"আধিভৌতিক"- অন্ন ব্যঞ্জন সন্দেশ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভৌতিক সামগ্রীর দ্বারা উদরের যে পূর্ত্তি হয়, তাহাই আধিভৌতিক পূর্ত্তি।
"আধ্যাত্মিক"- যাঁহারা বড়লোকের বাক্যে লুব্ধ হইয়া কালযাপন করেন, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক উদরপূর্ত্তি হয়।
"আধিদৈবিক"- দৈবানুকম্পায় প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি দ্বারা যাঁহাদের উদর পুরিয়া উঠে, তাঁহাদিগের আধিদৈবিক উদরপূর্ত্তি।
৩। এতন্মধ্যে আধিভৌতিক পূর্ত্তিই বিহিত।
ভাষ্য।– "বিহিত"- বিহিত শব্দের দ্বারা অন্যান্য পূর্ত্তির প্রতিষেধ হইল কি না, ভবিষ্যৎ ভাষ্যকারেরা মীমাংসা করিবেন।
এক্ষণে সিদ্ধ হইল, উদরনামক মহা-গহ্বরে লুচি সন্দেশ প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থের প্রবেশই পুরুষার্থ।
অতএব এ গর্ত্তের মধ্যে কি প্রকার ভূত প্রবেশ করান যাইতে পারে, তাহা নির্ব্বাচন করা যাইতেছে।
৪। বিদ্যা বুদ্ধি পরিশ্রম উপাসনা বল এবং প্রতারণা, এই ষড়বিধ পুরুষার্থের উপায়, পূর্ব্বপণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।
ভাষ্য।–১। "বিদ্যা"- বিদ্যা কি, তাহা অবধারণ করা কঠিন। কেহ কেহ বলেন, লিখিতে ও পড়িতে শিখাকে বিদ্যা বলে। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যার জন্য বিশেষ লিখিতে বা পড়িতে শিখার প্রয়োজন

নাই, গ্রন্থ লিখিতে, সম্বাদ পত্রাদিতে লিখিতে জানিলেই হইল। কেহ কেহ তাহাতে আপত্তি করেন যে, যে লিখিতে জানে না, সে পত্রাদিতে লিখিবে কি প্রকারে? আমার বিবেচনায় এরূপ তর্ক নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কুম্ভীরশাবক ডিম্ব ভেদ করিবামাত্র জলে গিয়া সাঁতার দিয়া থাকে, শিখিতে হয় না। সেইরূপ বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।
২। "বুদ্ধি"- যে আশ্চর্য্য শক্তিধারা তূলাকে লৌহ, লৌহকে তূলা বিবেচনা হয়, সেই শক্তিকেই বুদ্ধি বলে। কৃপণের সঞ্চিত ধনরাশির ন্যায় ইহা আমরা স্বয়ং সর্ব্বদা দেখিতে পাই, কিন্তু পরে কখন দেখিতে পায় না। পৃথিবীর সকল সামগ্রীর অপেক্ষা বোধ হয়, জগতে ইহারই আধিক্য। কেন না, কখন কেহ বলিল না যে, ইহা আমি অল্প পরিমাণে পাইয়াছি।
৩। "পরিশ্রম"- উপযুক্ত সময়ে ঈষদুষ্ণ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন, তৎপরে নিদ্রা, বায়ূ সেবন, তামাকুর ধূমপান, গৃহিণীর সহিত সম্ভাষণ ইত্যাদি গুরুতর কার্য্যসম্পাদনের নাম পরিশ্রম।
৪। "উপাসনা"- কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, হয় তাহার গুণানুবাদ, নয় দোষকীর্ত্তন করিতে হয়। কোন ক্ষমতাশালী প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে এরূপ কথা হইলে, যদি তিনি প্রকৃত দোষযুক্ত ব্যক্তি হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তন করাকে নিন্দা বলে। আর তিনি যদি দোষমুক্ত হয়েন, তবে তাঁহার দোষকীর্ত্তনকে স্পষ্টবক্তৃত্ব বা রসিকতা বলে। গুণ পক্ষে, তিনি যদি গুণহীন হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে ন্যায়নিষ্ঠতা বলে। আর যদি তিনি যথার্থ গুণবান্ হয়েন, তবে তাঁহার গুণকীর্ত্তনকে উপাসনা বলে।
৫। "বল"- দীর্ঘচ্ছন্দ বাক্য-মুখ চক্ষুর আরক্তভাব-ঘোরতর ডাক হাঁক,-মুখ হইতে অনর্গল হিন্দী, ইংরাজী এবং নিষ্ঠিবনের বৃষ্টি,-দূর হইতে ভঙ্গীদ্বারা কিল, চড়, ঘুষা এবং লাথি প্রদর্শন ও সার্দ্ধ তিপান্ন প্রকার অন্যান্য অঙ্গভঙ্গী-এবং বিপক্ষের কোন প্রকার উদ্যম দেখিলে অকালে পলায়ন ইত্যাদিকে বল বলে।
বল ষড়বিধ যথাঃ-
মৌখিক-অভিসম্পাত, গালি, নিন্দা প্রভৃতি।
হাস্ত-কিল, চড় প্রদর্শন প্রভৃতি।
পাদ-পলায়নাদি।
চাক্ষুষ-রোদনাদি। যথা, চাণক্যপণ্ডিত,- "বালানাং রোদনাং বলং" ইত্যাদি।
ত্বাচ-প্রহারসহিষ্ণুতা ইত্যাদি।
মানস-দ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা প্রভৃতি।
৬। প্রতারণা-
নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পৃথিবীমধ্যে প্রতারক বলিয়া জানিও।
এক, পণ্যজীব। প্রমাণ-দোকানদার জিনিস বেচিয়া আবার মূল্য চাহিয়া থাকে। মূল্য-দাতা মাত্রেরই মত যে, তিনি ক্রয়কালীন প্রতারিত হইয়াছেন।
দ্বিতীয়, চিকিৎসক। প্রমাণ-রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।
তৃতীয়, ধর্ম্মোপদেষ্টা এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি। ইঁহারা চিরপ্রথিত প্রতারক, ইঁহাদিগের নাম "ভণ্ড"। ইঁহারা

যে প্রতারক, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই যে, ইঁহারা অর্থাদির কামনা করেন না। ইত্যাদি।
৫। এই ষড়বিধ উপায়ের দ্বারা উদর পূর্ত্তি বা পুরুষার্থ অসাধ্য।
ভাষ্য।- এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের মত খণ্ডন করা যাইতেছে। বিদ্যাদি ষড়বিধ উপায়ের দ্বারা যে উদরপূর্ত্তি হইতে পারে না, ক্রমে তাহার উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।
"বিদ্যা"- বিদ্যাতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের অন্নাভাব কেন?
"বুদ্ধি"- বুদ্ধিতে যদি উদরপূর্ত্তি হইত, তবে গর্দ্দভ মোট বহিবে কেন?
"পরিশ্রম"- পরিশ্রমে যদি হইত, তবে বাঙ্গালি বাবুরা কেরাণী কেন?
"উপাসনা"- উপাসনাই যদি হইত, তবে সাহেবগণ কমলাকান্তকে অনুগহ করেন না কেন? আমি ত মন্দ পে-বিল লিখি নাই।
"বল"-বলই যদি হইত, তবে আমরা পড়িয়া মার খাই কেন?
"প্রতারণা"-প্রতারণাই যদি হইত, তবে মদের দোকান কখন কখন ফেল হইত না?
৬। উদরপূর্ত্তি বা পুরুষার্থ কেবল হিতসাধনের দ্বারা সাধ্য।
ভাষ্য।-উদাহরণ। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা লোকের কাণে মন্ত্র দিয়া তাহাদের হিতসাধন করিয়া থাকেন। ইউরোপীয় জাতিগণ অনেক বন্য জাতির হিতসাধন করিয়াছেন, এবং রুসেরা এক্ষণে মধ্য-আসিয়ার হিতসাধনে, নিযুক্ত আছেন। বিচারকগণ বিচার করিয়া দেশের হিতসাধন করিতেছেন। অনেকে সুবিক্রেয় এবং অবিক্রেয় পুস্তক ও পত্রাদি প্রণয়ন দ্বারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন। এ সকলের প্রচুর পরিমাণে উদরপূর্ত্তি অর্থাৎ পুরুষার্থলাভ হইতেছে।
৭। অতএব সকলে দেশের হিতসাধন কর।
ভাষ্য।-এই শেষ সূত্রের দ্বারা হিতবাদ দর্শন, এবং উদর দর্শনের একতা প্রতিপাদিত হইল। সুতরাং এই স্থলে কমলাকান্তের সূত্র-গ্রন্থের সমাপ্তি হইল। ভরসা করি, ইহা ভারতবর্ষের সপ্তম দর্শনশাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইবে।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

----

2 "ইউটিলিটি শব্দের অর্থ কি? ইহার কি বাঙ্গালা নাই? আমি নিজে ইংরেজি জানি না-কমলাকান্তও কিছু বলিয়া দেয় নাই-অতএব অগত্যা আমার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। আমার পুত্র ডেক্সনারী দেখিয়া এইরূপ ব্যখ্যা করিয়াছে "ইউ" শব্দে তুমি বা তোমরা, "টিল্" শব্দে চাষ করা, "ইট্" শব্দে খাওয়া, "ই" অর্থে কি, তাহা সে বলিতে পারিল না, কিন্তু বোধ করি কমলাকান্ত, "ইউ-টিল-ইট-ই" পদে ইহাই অভিপ্রেত করিয়াছেন যে, "তোমরা চাষ করিয়াই খাও" কি পাষণ্ড! সকলকেই চাষা বলিল! ঈদৃশ দুর্ব্বৃত্ত দশানন লম্বোদর গজাননের রচনা পাঠ করাতেও পাপ আছে। বোধ হয়, আমার পুত্রটি ইংরেজি লেখাপড়ায় ভাল হইয়াছে, নচেৎ এরূপ দুরুহ শব্দের সদর্থ করিতে পারিত না।-শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

০৪. পতঙ্গ

বাবুর বৈঠকখানায় সেজ জ্বলিতেছে –পাশে আমি, মোসায়েবি ধরণে বসিয়া আছি। বাবু দলাদলির গল্প করিতেছেন,- আমি আফিম চড়াইয়া ঝিমাইতেছি। দলাদলিতে চটিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিয়াছি। বিধিলিপি! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অনাদি ক্রিয়াপরম্পার একটি ফল এই যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করিয়া অদ্য রাত্রে নসীরাম বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া মাত্রা বেশী করিয়া ফেলিবেন। সুতরাং আমার সাধ্য কি যে, তাহার অন্যথা করি।

ঝিমাইতে ঝিমাইতে দেখিলাম যে, একটা পতঙ্গ আসিয়া ফানুসের চারি পাশে শব্দ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। "চোঁ-ও-ও-ও" "বোঁ-ও-ও" করিয়া শব্দ করিতেছে। আফিমের ঝোঁকে মনে করিলাম, পতঙ্গের ভাষা কি বুঝিতে পারি না? কিছুক্ষণ কাণ পাতিয়া শুনিলাম-কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মনে মনে পতঙ্গকে বলিলাম, "তুমি কি ও চোঁ বোঁ করিয়া বলিতেছ, আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।" তখন হঠাৎ আফিম প্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ প্রাপ্ত হইলাম- শুনিলাম, পতঙ্গ বলিল, "আমি আলোর সঙ্গে কথা কহিতেছি-তুমি চুপ কর।" আমি তখন চুপ করিয়া পতঙ্গের কথা শুনিতে লাগিলাম। পতঙ্গ বলিতেছে-

দেখ, আলো মহাশয়, তুমি সেকালে ভাল ছিলে –পিতলের পিলসুজের উপর মেটে প্রদীপে শোভা পাইতে-আমরা স্বচ্ছন্দে পুড়িয়া মরিতাম। এখন আবার সেজের ভিতর ঢুকিয়াছ-আমরা চারিদিকে ঘুরে বেড়াই-প্রবেশ করিবার পথ পাই না, পুড়িয়া মরিতে পাই না।

দেখ, পুড়িয়া মরিতে আমাদের রাইট আছে আমাদের চিরকালের হক্। আমরা পতঙ্গ জাতি, পূর্ব্বাপর আলোতে, পুড়িয়া মরিয়া আসিতেছি-কখন কোন আলো আমাদের বারণ করে নাই। তেলের আলো, বাতির আলো, কাঠের আলো, কোন আলো কখন বারণ করে নাই। তুমি কাচ মুড়ি দিয়া আছ কেন, প্রভু? আমরা গরিব পতঙ্গ-আমাদের সহমরণ, নিষেধের আইন জারি কেন? আমরা কি হিন্দুর মেয়ে যে, পুড়িয়া মরিতে পাব না?

দেখ, হিন্দুর মেয়ের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ। হিন্দুর মেয়েরা আশা-ভরসা থাকিতে কখন পুড়িয়া মরিতে চাহে না-আগে বিধবা হয়, তবে পুড়িয়া মরিতে বসে। আমরাই কেবল সকল সময়ে আত্মবিসর্জ্জনে ইচ্ছুক। আমাদের সঙ্গে স্ত্রীজাতির তুলনা?

আমাদিগের ন্যায়, স্ত্রীজাতিও রূপের শিখা জ্বলিতে দেখিলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে বটে। ফলও এক,-আমরাও পুড়িয়া মরি, তাহারাও পুড়িয়া মরে। কিন্তু দেখ, সেই দাহতেই তাদের সুখ,-আমাদের কি সুখ? আমরা কেবল পুড়িবার জন্য পুড়ি, মরিবার জন্য মরি। স্ত্রীজাতিতে পারে? তবে আমাদের সঙ্গে তাহাদের তুলনা কেন?

শুন, যদি জ্বলন্ত রূপে শরীর না ঢালিলাম, তবে এ শরীর কেন? অন্য জীবে কি ভাবে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা পতঙ্গজাতি, আমরা ভাবিয়া পাই না, কেন এ শরীর?-লইয়া কি করিব? নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্য্যকিরণে বিচরণ করি-তাহাতে কি সুখ? ফুলের সেই একই গন্ধ, মধুর সেই একই মিষ্টতা, সূর্য্যের সেই এক প্রকারই প্রতিভা। এমন অসার, পুরাতন বৈচিত্র্যশূন্য জগতে থাকিতে আছে? কাচের বাইরে আইস, জ্বলন্ত রূপশিখায় গা ঢালিব।

দেখ, আমার ভিক্ষাটি বড় ছোট-আমার প্রাণ তোমাকে দিয়া যাইব, লইবে না? দিব বৈ ত গ্রহণ

করিব না। তবে ক্ষতি কি? তুমি রূপ, পোড়াইতে জন্মিয়াছ, আমি পতঙ্গ, পুড়িতে জন্মিয়াছি; আইস, যার যে কাজ, করিয়া যাই। তুমি হাসিতে থাক, আমি পুড়ি।

তুমি বিশ্বধ্বংসক্ষম-তোমাকে রোধিতে পারে, জগতে এমন কিছুই নাই-তুমি কাচের ভিতর লুকাইয়া আছ কেন? তুমি জগতের গতির কারণ-কার ভয়ে তুমি ডোমের ভিতর লুকাইয়াছ? কোন্ ডোমে এ ডোম গড়িয়াছে? কোন্ ডোমে তোমাকে এ ডোমের ভিতর পুরিয়াছে? তুমি যে বিশ্বব্যাপী, কাচ ভাঙ্গিয়া আমায় দেখা দিতে পার না?

তুমি কি? তা আমি জানি না-আমি জানি না-কেবল জানি যে, তুমি আমার বাসনার বস্তু-আমার জাগ্রতের ধ্যান-নিদ্রার স্বপ্ন-জীবনের আশা-মরণের আশ্রয়। তোমাকে কখন জানিতে পারিব না-জানিতে চাহিও না-যে দিন জানিব, সেই দিন আমার সুখ যাইবে। কাম্য বস্তুর স্বরূপ জানিলে কাহার সুখ থাকে?

তোমাকে কি পাইব না? কত দিন তুমি কাচের ভিতর থাকিবে? আমি কাচ ভাঙ্গিতে পারিব না? ভাল থাক-আমি ছাড়িব না-আবার আসিতেছি-বোঁ-ও-ও

পতঙ্গ পড়িয়া গেল।-

নসীরাম বাবু ডাকিল, "কমলাকান্ত!" আমার চমক হইল-চাহিয়া দেখিলাম-বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না-দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল-আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে-সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে-কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধৰ্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই-মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই-কই, তাহা ত পাই না-আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই-আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধৰ্ম্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধৰ্ম্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত। অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,-আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্য্যোধন পতঙ্গকে পোড়াইলেন;-জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost।" ধৰ্ম্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ, "অ্যান্টনি, ক্লিওপেত্রা।" রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত", ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো"। গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধৰ্ম্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধৰ্ম্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

দেখ ভাই, পতঙ্গের দল, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোন ফল নাই। পার, আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া মর। না পার, চল, “বোঁ” করিয়া চলিয়া যাই।

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

০৫. আমার মন

আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল, সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম, সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়া ত আমার "মনচোর" কাহাকে পাইলাম না। তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি, পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেকচী-সমারূঢ়া অন্নপূর্ণার মৃদু মৃদু ফুটফুটবুটবুট-টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে ইলিস, মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগ-নন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায় পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পন করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্ম্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই, ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে, পাচকরূপী বিষ্ণুকর্ত্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ, আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তাহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্ত্তনায় পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না। পলান্ন, কোফ্তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই।

বন্ধু বলিলেন, একবার প্রসন্ন গোয়ালিনীর নিকট সন্ধান জান। প্রসন্নের সঙ্গে আমার একটু প্রণয় ছিল বটে, কিন্তু সে প্রণয়টা কেবল গব্যরসাত্মক। তবে প্রসন্ন দেখিতে শুনিতে মোটাসোটা, গোলগাল, বয়সে চল্লিশের নীচে, দাঁতে মিসি, হাসিভরা মুখ, কপালের একটি ছোট উল্কি টিপের মত দেখাইত; সে রসের হাসি পথে ছড়াইতে ছড়াইতে যাইত, আমি তাহা কুড়াইয়া লইতাম, এই জন্য লোকে আমার নিন্দা করিত। পূজারি বামণের জ্বালায় বাগানে ফুল ফুটিতে পায় না-আর নিন্দুকের জ্বালায় প্রসন্নের কাছে আমার মুখ ফুটিতে পায় না-নচেৎ গব্যরসে ও কাব্যরসে বিলক্ষণ বিনিময় চলিত। ইহাতে আমার নিজের জন্য আমি যত দুঃখিত হই, না হই, প্রসন্নের জন্য আমি একটু দুঃখিত। কেন না প্রসন্ন সতী, সাধ্বী, পতিব্রতা। এ কথাও আমি মুখ ফুটিয়া বলিতে পাই না। বলিয়াছিলাম বলিয়া, পাড়ার একটি নষ্টবুদ্ধি ছেলে ইহার বিপরীত অর্থ করিয়াছিল। সে বলিল যে, প্রসন্ন আছেন এজন্য সৎ বা সতী বটে, তিনি সাধু ঘোষের স্ত্রী, এজন্য সাধ্বী; এবং বিধবাবস্থাতেও পতিছাড়া নহেন, এজন্য ঘোরতর পতিব্রতা। বলা বাহুল্য যে, যে অশিষ্ট বালক এই ঘৃণিত অর্থ মুখে আনিয়াছিল, তাহার শিক্ষার্থ, তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার কলঙ্ক গেল না।

যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন স্পষ্ট কথা বলা ভাল-আমি প্রসন্নের একটু অনুরাগী বটে। তাহার

অনেক কারণ আছে-প্রথমতঃ, প্রসন্ন যে দুগ্ধ দেয়, তাহা নির্জ্জল, এবং দামে সস্তা; দ্বিতীয়, সে কখন কখন ক্ষীর, সর, নবনীত আমাকে বিনামূল্যে দিয়া যায়; তৃতীয়, সে একদিন আমাকে কহিয়াছিল, "দাদাঠাকুর, তোমার দপ্তরে ও কিসের কাগজ?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "শুনিবি?" সে বলিল, "শুনিব"। আমি তাহাকে কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িয়া শুনাইলাম-সে বসিয়া শুনিল। এত গুণে কোন্ লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি বশীভূত না হয়? প্রসন্নের গুণের কথা আর অধিক কি বলিব-সে আমার অনুরোধে আফিম্ ধরিয়াছিল।

এই সকল গুণে আমার মন কখন কখন প্রসন্নের ঘরে জানেলার নীচে ঘুরিয়া বেড়াইত, ইহা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কেবল তাহার ঘরের জানেলার নীচে নয়, তাহার গোয়ালঘরের আগড়ের পাশেও উঁকি মারিত। প্রসন্নের প্রতি আমার যেরূপ অনুরাগ, তাহার মঙ্গলা নামে গাইয়ের প্রতিও তদ্রূপ। এক জন ক্ষীর সর নবনীতের আকর, দ্বিতীয়, তাহার দানকর্ত্রী। গঙ্গা বিষ্ণুপদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভগীরথ তাঁহাকে আনিয়াছেন; মঙ্গলা আমার বিষ্ণুপদ; প্রসন্ন আমার ভগীরথ; আমি দুই জনকেই সমান ভালবাসি। প্রসন্ন এবং তাহার গাই, উভয়েই সুন্দরী; উভয়েই স্থূলাঙ্গী, লাবণ্যময়ী, এবং ঘটোঘ্নী। এক জন গব্যরস সৃজন করেন, আর এক জন হাস্যরস সৃজন করেন। আমি উভয়ের নিকট বিনামূল্যে বিক্রীত।

কিন্তু আজি কালি সন্ধান করিয়া দেখিলাম, প্রসন্নের গবাক্ষতলে, অথবা তাহার গোহালঘরে আমার মন নাই। আমার মন কোথা গেল?

কাঁদিতে কাঁদিতে পথে বাহির হইলাম। দেখিলাম, এক যুবতী জলের কলসী কক্ষে লইয়া যাইতেছে। তাঁহার মুখের উপর গভীর-কৃষ্ণ দোদুল্যমান কুঞ্চিতালকরাজি, গভীর-কৃষ্ণ ভ্রূযুগ, এবং গভীর-কৃষ্ণ চঞ্চল নয়নতারা দেখিয়া বোধ হইল, যেন পদ্মবনে কতকগুলো ভ্রমর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে-বসিতেছে না, উড়িয়া বেড়াইতেছে। তাহার গমনে যেরূপ অঙ্গ দুলিতেছিল, বোধ হইল, যেন লাবণ্যের নদীতে ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে; তাহার প্রতি পদক্ষেপে বোধ হইল, যেন পাঁজরের হাড় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল, নিঃসন্দেহ এই আমার মন চুরি করিয়াছে। আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সে ফিরিয়া দেখিয়া ঈষৎ রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি ও? সঙ্গ নিয়েছ কেন?"

আমি বলিলাম, "তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ।"

যুবতী কটূক্তি করিয়া গালি দিল। বলিল, "চুরি করি নাই। তোমার ভগিনী আমাকে যাচাই করিতে দিয়াছিল। দর কষিয়া আমি ফিরাইয়া দিয়াছি।"

সেই অবধি শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, মনের সন্ধানে আর রসিকতা করিতে প্রয়াস পাই না, কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছি যে, এ সংসারে আমার মন কোথাও নাই। রহস্য ছাড়িয়া সত্য কথা বলিতেছি, কিছুতেই আমার আর মন নাই। শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতায় মন নাই, যে রহস্যালাপের আমি প্রিয় ছিলাম, সে রহস্যালাপে আমার মন নাই। আমার কতকগুলি ছেঁড়া পুঁথি ছিল-তাহাতে আমার মন থাকিত, তাহাতে আমার মন নাই। অর্থসংগ্রহে কখন ছিল না-এখনও নাই। কিছুতেই আমার মন নাই-আমার মন কোথা গেল?

বুঝিয়াছি, লঘুচেতাদিগের মনের বন্ধন চাই; নহিলে মন উড়িয়া যায়। আমি কখন কিছুতে মন বাঁধি নাই-এজন্য কিছুতেই মন নাই। এ সংসারে আমরা কি করিতে আসি, তাহা ঠিক বলিতে পারি না-

কিন্তু বোধ হয়, কেবল মন বাঁধা দিতেই আসি। আমি চিরকাল আপনার রহিলাম-পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই। যাহারা স্বভাবতঃ নিতান্ত আত্মপ্রিয়, তাহারাও বিবাহ করিয়া, সংসারী হইয়া, স্ত্রী পুত্রের নিকট আত্মসমর্পণ করে, এজন্য তাহারা সুখী। নচেৎ তাহারা কিছুতেই সুখী হইত না। আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই। ধন, যশঃ, ইন্দ্রিয়াদিলব্ধ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। এ সকল প্রথম বারে যে পরিমাণে সুখদায়ক হয়, দ্বিতীয় বারে সে পরিমাণে হয় না, তৃতীয় বারে আরও অল্প সুখদায়ক হয়, ক্রমে অভ্যাসে তাহাতে কিছুই সুখ থাকে না। সুখ থাকে না, কিন্তু দুইটি অসুখের কারণ জন্মে; প্রথমতঃ অভ্যস্ত বস্তুর ভাবে সুখ না হউক, অভাবে গুরুতর অসুখ হয়; এবং অপরিতোষণীয়া আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধিতে যন্ত্রণা হয়। অতএব পৃথিবীতে যে সকল বিষয় কাম্য বস্তু বলিয়া চিরপরিচিত, তাহা সকলই অতৃপ্তিকর এবং দুঃখের মূল। সকল স্থানেই যশের অনুগামিনী নিন্দা, ইন্দ্রিয়সুখের অনুগামী রোগ, ধনের সঙ্গে ক্ষতি ও মনস্তাপ; কান্ত বপু জরাগ্রস্ত বা ব্যাধিদুষ্ট হয়; সুনামেও মিথ্যা কলঙ্ক রটে; ধন পত্নীজারেও ভোগ করে; মান সম্ভ্রম মেঘমালার ন্যায় শরতের পর আর থাকে না। বিদ্যা তৃপ্তিদায়িনী নহে, কেবল অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, এ সংসারের তত্ত্বজিজ্ঞাসা কখন নিবারণ করে না। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যা কখন সক্ষম হয় না। কখন শুনিয়াছি, কেহ বলিয়াছে, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া সুখী হইয়াছি বা যশস্বী হইয়া সুখী হইয়াছি? যেই এই কয় ছত্র পড়িবে, সেই বেশ করিয়া স্মরণ করিয়া দেখুক, কখন এমন শুনিয়াছে কি না। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কেহ এমন কথা কখন শুনে নাই। ইহার অপেক্ষা ধনমানাদির অকার্য্যকারিতার গুরুতর প্রমাণ আর কি পাওয়া যাইতে পারে? বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এমন একটা অকাট্য প্রমাণ থাকিতেও মনুষ্যমাত্রেই তাহার জন্য প্রাণপাত করে। এ কেবল কুশিক্ষার গুণ। মাতৃস্তন্য দুগ্ধের সঙ্গে সঙ্গে ধনমানাদির সর্ব্বসারবত্তায় বিশ্বাস শিশুর হৃদয়ে প্রবেশ করিতে থাকে-শিশু দেখে, রাত্রিদিন পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু ভৃত্য প্রতিবেশী শত্রু মিত্র সকলেই প্রাণপণে হা অর্থ, হা যশ, হা মান, হা সম্ভ্রম! করিয়া বেড়াইতেছে। সুতরাং শিশু কথা ফুটিবার আগেই সেই পথে গমন করিতে শিখে। কবে মনুষ্য নিত্য সুখের একমাত্র মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে? যত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, দার্শনিক, সংসারতত্ত্ববিৎ, যে কেহ আস্ফালন কর, সকলে মিলিয়া দেখ, পরসুখবর্দ্ধন ভিন্ন মনুষ্যের অন্য সুখের মূল আছে কি না। নাই। আমি মরিয়া ছাই হইব, আমার নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবে, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, এক দিন মনুষ্যমাত্রে আমার এই কথা বুঝিবে যে, মনুষ্যের স্থায়ী সুখের অন্য মূল নাই। এখন যেমন লোকে উন্মত্ত হইয়া ধন মান ভোগাদির প্রতি ধাবিত হয়, এক দিন মনুষ্যজাতি সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া পরের সুখের প্রতি ধাবমান হইবে। আমি মরিয়া ছাই হইব, কিন্তু আমার এ আশা একদিন ফলিবে! ফলিবে, কিন্তু কত দিনে! হায়, কে বলিবে, কত দিনে!

কথাটি প্রাচীন। সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ এই কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর, শত সহস্র লোকশিক্ষক শত সহস্র বার এই শিক্ষা শিখাইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই লোকে শিখে না- কিছুতেই আত্মাদরের ইন্দ্রজাল কাটাইয়া উঠিতে পারে না। আবার আমাদের দেশ ইংরেজি মুলুক হইয়া এ বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজি শাসন, ইংরেজি সভ্যতা ও ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে “মেটিরিয়েল্ প্রস্পেরিটির3” উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্য সম্পদ্ বড় ভালবাসেন- ইংরেজি সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন-তাঁহারা আসিয়া এদেশের

বাহ্য সম্পদ্ সাধনেই নিযুক্ত-আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্ত্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে-সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্য সম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে-দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দু-ভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল-দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? কাহারও মনের আগুন নিবাইতে পারিবে? ঐ যে কৃপণ ধনতৃষায় মরিতেছে, উহার তৃষা নিবারণ করিবে? অপমানিতের অপমান ফিরাইতে পারিবে? রূপোন্মত্তের ক্রোড়ে রূপসীকে তুলিয়া বসাইতে পারিবে? না পারে, তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও-কমলাকান্ত শর্ম্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।

কি ইংরেজি, কি বাঙ্গালা, যে সম্বাদ-পত্র, সাময়িক পত্র, স্পীচ, ডিবেট, লেকচার, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্য সম্পদ্ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে, ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্ বম্ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থ-প্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক! টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্য সম্পদ্। হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত; এডাম্ স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজি সম্বাদ-পত্রসকল ঢাক ঢোল, বাঙ্গালা সম্বাদ-পত্র কাঁসিদার; শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে, আইস, সবে মিলিয়া বাহ্য সম্পদের পূজা করি। আইস, যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া, বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া, এই মহাদেবের পূজা করি। বল, হর হর বম্ বম্! বাহ্য সম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক ঢোল,-ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁসিদার,-ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং! আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটিলিটেরিয়েন্ কামার! পাঁটা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি; একবার বাবা পঞ্চানন্দের4 নাম করিয়া এক কোপে পাচার কর! হর হর বম্ বম্! কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও! তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর!

পূজা কর, ক্ষতি নাই, কিন্তু আমাকে গোটাকত কথা বুঝাইয়া দাও। তোমার বাহ্য সম্পদে কয় জন অভদ্র ভদ্র হইয়াছে? কয় জন অশিষ্ট শিষ্ট হইয়াছে? কয় জন অধার্ম্মিক ধার্ম্মিক হইয়াছে? কয়জন অপবিত্র পবিত্র হইয়াছে? এক জনও না? যদি না হইয়া থাকে, তবে তোমার এই ছাই আমরা চাহি না-আমি হুকুম দিতেছি, এ ছাই ভারবর্ষ হইতে উঠাইয়া দাও।

তোমাদের কথা আমি বুঝি। উদর নামে বৃহৎ গহ্বর, ইহা প্রত্যহ বুজান চাই; নহিলে নয়। তোমরা বল যে, এই গর্ত্ত যাহাতে সকলেরই ভাল করিয়া বুজে, আমরা সেই চেষ্টায় আছি। আমি বলি, সে মঙ্গলের কথা বটে, কিন্তু উহার অত বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। গর্ত্ত বুজাইতে তোমরা এমনই ব্যস্ত

হইয়া উঠিতেছ যে, আর সকল কথা ভুলিয়া গেলে। বরং গর্ত্তের এক কোণ খালি থাকে, সেও ভাল, তবু আর আর দিকে একটু মন দেওয়া উচিত। গর্ত্ত বুজান হইতে মনের সুখ একটা স্বতন্ত্র সামগ্রী; তাহার বৃদ্ধির কি কোন উপায় হইতে পারে না? তোমরা এত কল করিতেছ, মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কিছু কল হয় না? একটা বুদ্ধি খাটাইয়া দেখ, নহিলে সকল বেকল হইয়া যাইবে।

আমি কেবল চিরকাল গর্ত্ত বুজাইয়া আসিয়াছি–কখন পরের জন্য ভাবি নাই। এই জন্য সকল হারাইয়া বসিয়াছি–সংসারে আমার সুখ নাই; পৃথিবীতে আমার থাকিবার আর প্রয়োজন দেখি না। পরের বোঝা কেন ঘাড়ে করিব, এই ভাবিয়া সংসারী হই নাই। তাহার ফল এই যে, কিছুতেই আমার মন নাই। আমি সুখী নহি। কেন হইব? আমি পরের জন্য দায়ী হই নাই, সুখে আমার অধিকার কি? সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহনিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া, তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে। যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্য-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ; অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয়, সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে কমলাকান্ত যুক্তকরে সকলের নিকট নিবেদন করিতেছে, তোমরা কেহ কমলাকান্তের একটি বিবাহ দিতে পার?

----

3 বাহ্য সম্পদ্।

4পঞ্চানন নাম প্রসিদ্ধ নহে–পঞ্চানন্দই প্রসিদ্ধ। মদ্য, মাংস, গাড়িজুড়ি, পোষাক এবং বেশ্যা–এই পাঁচটি আনন্দে এই নূতন পঞ্চানন্দ।

০৬. চন্দ্রালোকে

এই তৃণ-শষ্প-শোভিত হরিৎক্ষেত্র, এই কলবাহিনী ভাগীরথী-তীরে, এই স্ফুটচন্দ্রা-লোকে, আজি দপ্তরের শ্রীবৃদ্ধি, কলেবর-বৃদ্ধি করিব। এইরূপ চন্দ্রালোকেই না ট্রেলস্ শর্ম্মা ট্রয়ের উচ্চ প্রাচীরে আরোহণ করিয়া, ক্রিসীদাকে স্মরণ করিয়া, উষ্ণ শ্বাস ত্যাগ করিতেন! এইরূপ চন্দ্রালোকেই না থিবসী সুন্দরী এইরূপ মৃদু শিশির-পাত-সিক্ত শষ্প মৃদু পদে দলিত করিয়া পিরামাসের সঙ্কেতস্থানাভিমুখে অভিসারিণী হইতেন? অভিসারিণী শব্দটিতে অভি একটি উপসর্গ আছে, সৃ একটি ধাতু আছে এবং স্ত্রীবাচক একটি 'ইনী' আছে; এই জীবনে কমলাকান্ত শর্ম্মা কত উপসর্গ দেখিলেন, কত লোকের ধাতু ছাড়িল গঠিল দেখিলেন, কত ইনীও এলেন গেলেন, কিন্তু সোপসর্গ ধাতুবিশিষ্ট একটি ইনীও কখন দেখিলাম না। কমলাকান্ত উপসর্গে কোন ইনীর ধাতু বিগড়াইল না। কমলাভিসারিণী, এরূপ নায়িকা কখন হইল না। যাহারা দধি দুগ্ধ বিক্রয়ার্থ আগমন করে, তাহাদিগকে শ্রীম্ভাগবতে "পসারিণী" বলিয়াছে, কখন অভিসারিণী বলিয়াছে, এরূপ স্মরণ হয় না, তাহা যদি বলিত, তাহা হইলে অনেক অভিসারিণী দেখিয়াছি বলিতে পারিতাম।

চন্দ্র, তুমি হাস্য করিতেছ? হেসে হেসে ভেসে উঠিতেছ? তোমার সাতাইশ ইনী শুদ্ধ আমাকে দেখিয়া, আমার প্রতি চক্ষু টিপিয়া উপহাস করিতেছ? দক্ষ রাজার যেমন কর্ম্ম- একেবারে সাতাইশটিকে এক চন্দ্রে সমর্পণ করিলেন, আর এখন কমলাকান্ত শর্ম্মা বিবাহের জন্য লালায়িত! অমল-ধবল কিরণরাশি সুধাংশো! আর সকল তোমার থাক্, তুমি অন্ততঃ অশ্লেষা মঘাকে ছাড়িয়া দেও, আমি ওই দুইটিকে বড় ভালবাসি। আমার মত নিষ্কর্ম্মা লোক উহাদের কল্যাণে অন্ততঃ দুই দিন গৃহবাসসুখ উপলব্ধি করিতে পারে। আমি ঐ ভগিনীদ্বয়কে আমার ভবনে চিরকাল জন্য স্থান দান করিয়া, সুখে কাল কর্ত্তন করিব। ইহাদিগের আরও অনেক গুণ আছে-লোকে নিজে অক্ষমতানিবন্ধন কোন কর্ম্ম করিতে না পারিয়া, স্বচ্ছন্দে ইহাদিগের দোহাই দিয়া, লোকের কাছে আস্ফালন করিতে পারে। আমিও নসীবাবুর কাপড় কিনিতে যদি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ প্রতারিত হইয়া আসি, তবে আমার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ের স্কন্ধে সমস্ত দোষ অর্পণ করিয়া সাফাই করিতে পারিব। চন্দ্রদেব! তুমি আমার কথায় কর্ণপাত করিলে না? এখনও মন্দাকিনীর মন্দান্দোলিত বক্ষ-বসন করস্পর্শে প্রতিভাসিত করিতেছ? এখনও মন্দ সমীরণের সহ পরামর্শ করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে পলকে পলক ঝলক বর্ষণ করিবে? এখনও তৃণক্ষেত্রে মণি মুক্তা মরকত অকাতরে ছড়াইয়া দিবে? উলুবনে মুক্তা, আর কেহ ছড়াক আর না ছড়াক, দেখিতেছি তুমি ছড়াইয়া থাক। আর আজ আমি ছড়াইব!

এই সংসারের লোক, এই বল্লালসেনের প্র-পরা-অপ-পৌত্রেরা এবং তাঁহার নির্-দুর্-বি-অধি-দৌহিত্রেরা আমাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। আমার বক্ষের উপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বি, এ, না হলে বিয়ে হয় না। এইবার সংসার ডুবিল। উচ্চ শিক্ষায় ফল কি? ছাপর খাট-রূপার কলসী, গরদের কাচা, এবং স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিতা, পট্টবসনাবৃতা, একটি বংশখণ্ডিকা! হরি হরি বল, ভাই! তৃণগ্রাহী পাণ্ডিত্যাভিমানী বি, এ, উপাধিকারী উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত নব বঙ্গবাসীর, কলসী বস্ত্র বংশ খট্টাসমেত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হইল!!!5 প্রথমে উপাধি পাইয়াছিলেন, এবার সমাধি পাইলেন, তিনি বিলাতী ব্রহ্মে লীন হইলেন। বঙ্গীয় যুবক সংসারী হইলেন। তাঁহার উচ্চশিক্ষা তাঁহাকে তাঁহার চরমধামে পৌঁছিয়া দিয়াছে। তিনি সহস্র তোলক পরিমিত রজতপাত্র, শত তোলক পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার এবং সংসার-

কুটীরের একমাত্র দণ্ডিকা, একটি বংশ-খণ্ডিকা, পাইয়াছেন, তিনি তাঁহার চিরবাঞ্ছিত হেমকূট পর্ব্বত নিকটস্থ কিষ্কিন্ধ্যাপুরীর সরকারি ওকালতী পাইয়াছেন, হরি হরি বল, ভাই! তাঁহার এত দিনে সমাধি হইল!!! তিনি উচ্চশিক্ষালাভার্থ বহু যত্নে কামস্কট্কা দেশের নদীসকলের নাম কণ্ঠাগ্রে করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি নিশীথপ্রদীপে অনন্যমনে শাহারা মরুভূমির বালুকাপুঞ্জের সংখ্যা অবধারণ করিয়াছিলেন। এই উচ্চশিক্ষার জন্যই শার্লিমানের ঊর্দ্ধে বায়ান্ন পুরুষ, নিম্নে সাড়ে তিপ্পান্ন পুরুষের কুলচি মুখস্থ করিয়াছেন। এই উচ্চশিক্ষা-বলে তিনি শিখিয়াছেন যে, টাউনহলে বক্তৃতা করিতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ; ইংরেজের নিন্দা যে কোন প্রকারে করিতে পারিলেই রাজনীতির একশেষ হইল। এবং বংশ-দণ্ডিকা স্থাপন করিয়া উমেদার গোষ্ঠীর বৃদ্ধি করিয়া দেশ জঙ্গলময় করিতে পারিলেই কলির জীবধর্ম্মের চরিতার্থতা হইল।
এরূপ বংশ-দণ্ডিকা-প্রয়াসী আমি নহি; আমি উইল করিয়া যাইব, সাত পুরুষ বিবাহ করিতে না হয় তাও কর্ত্তব্য, তথাপি এরূপ বংশ-দণ্ডিকা আশ্রয়ে স্বর্গ-প্রাপ্তির বাঞ্ছাও কেহ না করে। যদি জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করাই বিবাহের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি মৎস্যাদি বিবাহ করিব, যদি টাকার জন্য বিবাহ করিতে হয়, তবে আমি টাকশালের অধ্যক্ষকে বিবাহ করিব; আর যদি সৌন্দর্য্যার্থে বিবাহ করিতে হয়, তবে-ঘোমটাটানা চাঁদবদনীদের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, ঐ আকাশের চাঁদকে বিবাহ করিব।
ভাগীরথি! যদি তুমি শান্তনুবক্ষে অথবা তদপেক্ষা উচ্চতর হিমালয়-ভবনে, অথবা আরো উচ্চতর ধূর্জ্জটির জটা-কলাপে বিরাজ করিতে, তাহা হইলে কে আজ তোমার উপাসনা করিত? তুমি নীচগা হইয়া, মর্ত্ত্যে অবতরণ করিয়া সহস্রধা হইয়া সাগরোদ্দেশে গমন করিয়াছিলে বলিয়াই সাগর-বংশের উদ্ধার হইয়াছে। সমীরণ! তুমি যদি অঞ্জনার অঞ্চল লইয়া চিরক্রীড়াসক্ত থাকিতে, অথবা মলয়াচলে স্বীয় প্রমোদভবনে চন্দন-শাখা নমিত করিয়া বা এলা লতা কম্পিত করিয়া পরিভ্রমণ করিতে, তাহা হইলে কে তোমাকে “ত্বমেব জগজ্জীবনং পালনং” বলিয়া আর তোমার স্তব-স্তুতি করিত? এই বাল-বসন্ত-বিহারী বিহঙ্গমকুলের কাকলি যদি কেবল নন্দন কাননেই প্রতিধ্বনিত হইত, তাহা হইলে কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তাহাদের নাম করিয়া এই রাত্রিকালে স্বীয় মসী লেখনীর অনর্থক ক্ষয় করিবে কেন? সুধাংশো! যদি তুমি ক্ষীরোদ-সাগর-তলে, অমৃত-ভাণ্ডারে, প্রবাল-পালঙ্কে মৌক্তিক-শয্যায় শয়িত থাকিতে, তাহা হইলে কে তোমার সহিত রমণী-মুখ-মণ্ডলের তুলনা করিত? অথবা তোমার ঐ সাতাইশটি ক্রমান্বয় ভর্ত্তৃকা লইয়া খলু সার শ্বশুর-মন্দির দক্ষালয়ে বাস করিতে, তাহা হইলে আজি কমল শর্ম্মা কি তোমার দর্শনাভিলাষী হইয়া-এই শ্মশাননিকট বটতলায় তীরস্থ হইয়া বাস করে?
শশী! যদি তোমার ব্যাকরণ পড়া থাকে, তবে আমাকে মাপ করিও, আমি প্রাণান্তেও শশিন্ বলিতে পারিব না-আমি এতক্ষণ তোমার গুণের অনুধ্যান করিতেছিলাম; শশী, তুমি অনাথার কুটীরদ্বারে প্রহরী রূপে অনিমেষনয়নে বসিয়া থাক, আধভাষী শিশু যখন নাচিতে নাচিতে তোমায় ধরিতে যায়, তুমি তাহার সঙ্গে নাচিতে নাচিতে খেলা কর, বালিকা যখন স্বচ্ছ সরোবর-হৃদয়ে তোমায় একবার দেখিতে পাইয়া, একবার না পাইয়া, তোমার সন্দর্শন লাভার্থ, ইতস্ততঃ সরোবরকূলে দৌড়িতে থাকে, তখন তুমি এক একবার ঈষৎ দেখা দিয়া তাহার সহিত কেবল লুকোচুরি খেলিতে থাক, নববধূ যখন মন্দ বাত সহিত প্রাসাদোপরি একাকিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে থাকে, তখন তুমি নারিকেলকুঞ্জান্তরাল হইতে অতি ধীরে ধীরে তাহার হৃদয় ভরিয়া অমৃত বর্ষণ করিয়া তাহাকে ক্রমে শীতল কর; যখন তরঙ্গিণী আশা-তরঙ্গিত-হৃদয়ে ধীর প্রবাহে মন্দগতিতে সিন্ধু-অভিগামিনী হয়, তখন তুমিই তাহাকে স্বর্ণ-ভূষণে

ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া পথ প্রদর্শন করিয়া থাক; গোলাপ যখন বসন্ত-রাগে এক বৃন্তে চারিদিক্ দেখিয়া হেলিতে দুলিতে থাকে, আবার সেই তুমিই অসদাভিসন্ধিৎসু নর যখন কুলকামিনীর ধর্ম্মনাশে প্রবৃত্ত হয়, তখন তোমার কোমল মুখমণ্ডলে এমনি ভ্রূকুটি করিতে থাক যে, সে তোমার মুখপানে আর দৃষ্টিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় না তুমিই নরহত্যাকারীর তরবারিফলকে বিদ্যুৎ চমকাইয়া দেও, তাহার পাপ শোণিত-বিন্দুতে চৌষট্টি রৌরব প্রতিফলিত করিয়া দেখাইয়া দেও।
তুমি ক্রীড়াশীল শিশুর চলৎ স্বর্ণস্থালী, তরুণের আশা-প্রদীপ; যুবক যুবতীর যামিনী-যাপনের প্রধান সম্ভোগ-পদার্থ; এবং স্থবিরের স্মৃতি-দর্পণ। তুমি অনাথার প্রহরী, স্থির দীপধারী, তুমি পথিকের পথপ্রদর্শন; গৃহীর নৈশ সূর্য্য; তুমি পাপীর পাপের সাক্ষী; পুণ্যাত্মার চক্ষে তাঁহার যশঃপতাকা। তুমি গগনের উজ্জ্বল মণি; জগতের শোভা। আর এই শ্মশানবিহারী শ্রীকমলাকান্তের একমাত্র সম্বল; তুমি ভালোর ভাল, মন্দের মন্দ ; রসের রস, বিরসে বিষ। তুমি কমলাকান্তের সহধর্ম্মিণী; শশী, আমি তোমায় বড় ভালবাসি, আমি তোমাকেই বিবাহ করিব। সকলে হরি হরি বল, ভাই! আজ এইখানে বাসর যাপন- সকলে একবার হরি হরি বল, ভাই!
বম্ ভোলানাথ! চন্দ্র যে পুরুষ! তবে ডবল মাত্রা চড়াইতে হইল।
চন্দ্র আমাদিগের আর্য্য মতে পুরুষ বটে, কিন্তু বিলাতীয় শর্ম্মাদিগের মতে ইনি কোমলাঙ্গী। আমাদিগের মতে চন্দ্র হি,6 হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে?
বাস্তবিক এই বিষয়ে সংসারের লোকের সঙ্গে আমার কখন মতের ঐক্য হইল না। আমার এ বিষয়ে নানা সন্দেহ হয়। যে ওয়াজিদালিশাহা লক্ষনৌ নগরী হইতে স্বচ্ছন্দে চতুর্দ্দোলারোহণে মুচিখোলায় আগমন করিয়া, হংস হংসী কপোত কপোতী লইয়া ক্রীড়া করেন, গোলাপ সহিত বারি-হ্রদে নিত্য স্নান করিয়া, স্বীয়ানুরূপী পিঞ্জরস্থ বুলবুলিকে সঘৃত পলান্ন প্রদান করেন, তিনি হি না শী? এবং যে মহিষী-দেশ-বাৎসল্যে ঐহিক সুখ সম্পত্তি বিসর্জ্জন করিয়া-রাজপুরুষগণের শরণাপন্ন হওয়াপেক্ষা ভিক্ষান্ন শ্রেয়ঃ বোধে, নেপালের পর্ব্বতীয় প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছেন, তিনি শী না হি? তবে ত সাহসকে হি-শীর প্রভেদক করা যায় না। তবে যুদ্ধ-নৈপুণ্যে হি-শীর প্রভেদ হইবে? যে জোয়ান, ওর্লিয়ান্স দুর্গ আক্রমণকালে সর্ব্বপ্রথমে পদার্পণ করিয়াছিল, যে ফ্রান্সের পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব, না শী বলিব? না, হি বলিব? আর যে বেডফোর্ড-তাহাকে পাকচক্রে ফেলিবার জন্য সেই জোয়ানের কারাগারে পুরুষের বস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছিল, তাহাকেই বা হি বলিব, না শী বলিব? না, যুদ্ধ-কৌশলে বুঝিতে পারিলাম না। তবে শুনা যায়, যে বলীয়ান্, সেই পুরুষ, আর যে জাতি দুর্ব্বল, তাহারাই স্ত্রীলোক। ভাল-কোমৎ আপনাকে নীতিরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা স্থির করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কর যাচ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই অতুল প্রতাপশালীকে যে মাদম ক্লোতিলড দেবো স্বীয় প্রতাপের আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব? রোমক পত্তনের কৈসরগণ এক একজন পৃথিবীর রাজা, যে মৈসরী রাজ্ঞী ক্লিওপেটরা এরূপ তিন জন কৈসরের উপর রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাকে শী বলিব, না হি বলিব? বাস্তবিক জগতে কে হি, কে শী, তাহা স্থির করা যায় না। সে দিন কীর্ত্তন হইতেছিল, যখন কীর্ত্তন-গায়িকা বলিল- "সিংহিনী হইয়া শিবাপদ সেবিব?" এবং বঙ্গ নব্য-সম্প্রদায়েরা মন্ত্রস্তব্ধবৎ, চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, আমার বাস্তবিক সেই কীর্ত্তন-গায়িকাকে সিংহবৎ বোধ হইয়াছিল এবং সেই সমস্ত বাঙ্গালি যুবককেই আমি শিবাস্বরূপ মনে করিয়াছিলাম। তখন যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করিত, এর কোনগুলি হি, আর

কোনগুলিই বা শী ; তাহা হইলে আমি অবশ্য বলিতাম যে, সেই কীর্ত্তনকারিণীই হি এবং তাহার জড়বৎ শ্রোতৃবর্গই শী। বাস্তবিক বঙ্গীয় যুবকেরা কোথাও হি, কোথাও শী, এবং সর্ব্বত্র বিকল্পে ইট্ হন। তাহার নিত্যবিধিও আছে। যথা-ইয়ারকিতে হি, শয্যাগৃহে শী, এবং বিষয়কর্ম্মে ইট্। তাঁহারা বক্তৃতার সময়ে হন হি, সাহেবের কাছে শী, মদ খাইলে হন ইট্। ফলে ইট্ যাহা হউক, হি, শীর বিষয়ে আমার আপনা আপনি অনেক সন্দেহ হয়। মধু চাটুয্যে আমার নাম সংযোগ করিয়া কি বিদ্রুপ করিয়াছিল বলিয়া যে প্রসন্ন, স্বচ্ছন্দে পূর্ণদুগ্ধ-কুম্ভ তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া, চাটুয্যের বক্ষ-কবাটের বল পরীক্ষা করণার্থ কোনরূপ বিশেষ আয়ুধ প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, সে প্রসন্ন সংসারের মতে হইল শী-আর আমি-নসীবাবু কি না একদিন বলিয়াছিলেন যে,- "চক্রবর্ত্তী ঝিমুতে ঝিমুতে আজ বিছানাটা পোড়ালে, একদিন একটা লঙ্কাকাণ্ড করিবে দেখছি"-সেই ভয়ে আফিঙ্গের মাত্রা কমাইয়া দিলাম, সেই আমি হইলাম হি? এইরূপ বিচারের জন্যই সংসারের সঙ্গে আমার বিবাদ বিসম্বাদ। ফল কথা, যখন আমি নিজে হি, কি শী, তাহা নিশ্চয় করা দুষ্কর, তখন চন্দ্র হি কিম্বা শী, তাহার স্থিরতা কি প্রকারে হইবে? যদি চন্দ্র হি হয়েন, ত আমি শী-কেন না, আমার সহিত চন্দ্রের ভালবাসা জন্মিয়াছে। এবং আমার চন্দ্রকে বিবাহ করিতেই হইবে। আর আমি যদি প্রকৃত একজন কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী হই, তাহা হইলে চন্দ্র শী। চন্দ্র বিলাতীয় মতে শী। আমি তাহা হইলে চন্দ্রকে বিলাতীয় মতে পাণিগ্রহণ করিব।

এখন নানা মতে নানা কার্য্য হইতেছে; আমি বিলাতীয় মতে বিবাহ করিব। এখন দশাবতার দশককর্ম্মান্বিত হইয়াছেন। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ টেবিলের শোভা সম্বর্দ্ধন করিতেছেন। নৃসিংহরাম কমলাকান্তরূপ দৈত্যকুলের প্রহ্লাদগণের আশ্রয়ীভূত হইয়াছেন। বামনাবতারে বঙ্গীয় যুবকগণ, আমার সোণারচাঁদ শশীকে স্পর্শ করিতে স্পর্দ্ধা করে। প্রথম রামের স্থানে ইঁহারা মাতৃ-সেবা, দ্বিতীয় রামের স্থানে পত্নী-সেবা, এবং শেষ রামের নিকটে বারুণী-সেবা শিক্ষা করিয়াছেন। ইঁহারা বৌদ্ধ-মতে সংসারের অনিত্যতা স্থির করিয়া, কল্কিমতে সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। এখনকার কালে শাক্ত-মতে ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া, তাহা শৈব ত্রিশূলে বিদ্ধ করিয়া গলাধঃকরণ করিতে হয়; তাহার পর সৌর পান সেবনীয়। আবার জিরুশালমের প্রথম গৌরাঙ্গের উপদেশ মত ভজনশালা করিতে হয়। মেজো গৌরাঙ্গ নবদ্বীপবাসীর মত হরি-সংকীর্ত্তন করিতে হয়, রাধানগরের ছোট গৌরাঙ্গের মত সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিতে হয়।

সুতরাং শশী, পূর্ণশশী, আজি আমি তোমাকে ইংরাজী মতে, শী স্থির করিয়া, হোস্ বাহালে সুস্থ শরীরে, খোস্ তবিয়তে ইচ্ছাপূর্ব্বক বিবাহ করিলাম। আমি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে অন্যের বিনা সরিকাতে তোমাতে ভোগ দখল করিতে থাকিব। ইহাতে তুমি কিম্বা তোমার স্থলাভিষিক্ত কেহ কখন কোন আপত্তি কর বা করে, তাহা নামঞ্জুর হইবে। তোমার সাতাইশটিতে আজ হইতে আমার সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকার হইল।

আর অমন করিয়া, পা টিপিয়া, পা টিপিয়া, ঢলে পড়িয়া রোহিণীর সঙ্গে কথা কহিলে কি হইবে? আর অমন মুচকে হেসে পাতলা মেঘের ঘোমটা টেনে তর্ তর্ করিয়া কত দূর চলিয়া যাইবে? ইতি কোর্টশিপ্ সমাপ্তঃ-

এক্ষণে গান্ধর্ব্ব বিবাহ। আমি বরমাল্য প্রদান করিলাম, তুমি করমাল্য প্রদান কর।

কন্যাকর্ত্তা হৈল কন্যা, বরকর্ত্তা বর ।
নিজ মন পুরোহিত, শ্মশানে বাসর ।।

একবার হরি বল, ভাই! হরি হরি বোল।
আজ অবধি আর চন্দ্রকে দেখিয়া কমল মুদ্রিত হইবে না। কমল ফুল্ল হইতে দেখিলে আর চন্দ্র ম্লান হইবে না। এইবার ভারতবর্ষীয় কবিগণের কবিত্ব লোপ হইল-পূর্ব্বে

কমল মুদিত আঁখি চন্দ্রেরে হেরিলে,
এখন
চন্দ্রেরে দেখিতে দেখ কমল আঁখি মিলে।
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল,
কিন্তু
কমল হৃদয়ে চন্দ্র কেবল উজ্জ্বল।

আহা! আমি আমার চন্দ্রকে হারাইয়া দিয়াছি। বর বড়, না ক'নে বড়, এই দেখ, বর বড়-

চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়,
চক্রবর্ত্তী পরিপূর্ণ এক কাঁদি কলায়।
সেই কলা কভু লুপ্ত কভু বর্ত্তমান।
কমলের বাগানের সব মর্ত্তমান।

দেখ শশী, এখন নির্জ্জন হইল। তোমাকে গোটাকত কথা বলিতে ইচ্ছা করি।
তুমি তোমার রূপ-গৌরবে গর্ব্বিতা হইয়া যেখানে সেখানে ও রূপের ছড়াছড়ি করিও না। যখন পুত্র-শোকাতুরা মাতা বক্ষে করাঘাত করিয়া তোমার দিকে লক্ষ্য করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে, তখন তুমি তাহার কাছে রূপ দেখাইয়া কি করিবে? তখন কলঙ্কিনি! তোমার রূপরাশি গাঢ় মেঘান্তরালে লুক্কায়িত করিয়া রাখিও। যখন সংসারজ্বালাজালে লোকে দগ্ধ হইয়া তোমার দরবারে আসিয়া অভিযোগ করিবে, তখন তোমার সৌন্দর্য্য-বিকাশ তাহার কাছে করিও না; যে সংসারদগ্ধ, তাহার পক্ষে সে সৌন্দর্য্য তীব্র বিষ-ক্ষেপরূপ হইবে। বরং রক্তরাগে তাহার সহিত আলাপ করিও। যে সকলকে ঘৃণা করিয়াছে, কাহারও প্রীতি সে সহ্য করিতে পারে না। আর যে ঐহিক চরম সুখের সীমা উপলব্ধি করিয়া আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাকে আর বৃথা আশা দিয়া সান্ত্বনা করিও না। তুমি এক্ষণে আমার এক-ভোগ্যা, তুমি আর কি দেখাইয়া অপরকে সান্ত্বনা করিবে? কিন্তু কমলার্জ্জকান্তের সময় অসময় নাই, ঘটন বিঘটন নাই, সুখ দুঃখ নাই। তুমি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিবে; তোমার নিজকথা আমাকে বলিবে, আমার কথা শুনিইয়া যাইয়া, আপনার অন্তরে আপনার অস্থি-মজ্জার সহিত সেই কথা মিশাইয়া, রাখিয়া দিবে। তুমি জ্যোৎস্না রাত্রিতে আমার সহিত দেখা করিতে আসিও, ও কোমল কান্তি লইয়া অন্ধকারে বিচরণ করিও না। অদ্য আমাদের যে সুখের দিন, তাহা তুমি আমি ব্যতীত কে বুঝিতে পারিবে? অদ্য হইতে মাস গণনা করিয়া, প্রতি মাসের শেষে আমরা এই গঙ্গাতীরে শষ্প-বাসর সমাপন করিব। সকল পূর্ণ মাসেই তুমি হঠাৎ আমার কাছে আগমন করিও না; পঞ্জিকাকারগণের সহিত দিন-ক্ষণের পরামর্শ করিয়া কমলাভিসারিণী হইও, নচেৎ একদিন রাহু

তোমাকে পথিমধ্যে হঠাৎ মসীময়ী করিয়া ক্লিষ্ট করিবে। আর এই বিবাহ-রাত্রিতে নব বধূকে অধিক উপদেশ প্রদান করিতে গেলে ধর্ম্ম-যাজকতার ভাণ হয়। সুতরাং অলমতিবিস্তরেণ।
এখন একবার,

কমল শশীর বাসর ঘরে,
ডাক রে কোকিল পঞ্চম স্বরে !

এখন শশী, একবার এই মর্ত্তলোকে অবতীর্ণ হইয়া তরঙ্গের উপর অপ্সরা-ছাঁদে নৃত্য কর দেখি! একবার কাল মেঘের ভিতর বেগে দৌড়াইয়া গিয়া, একবার অনন্ত গগনের অনন্ত পথে উল্টাইয়া পড় দেখি! একবার গভীর মেঘে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রন্ধ্রপথে এক চক্ষু দিয়া আমার দিকে মধুর দৃষ্টিপাত কর দেখি! একবার দ্রুত নক্ষত্রে নক্ষত্রে কলহ বাধাইয়া দিয়া, তাহারা যেমন পরস্পর সংগ্রাম করিতে আসিবে, অমনি তাহাদের উভয় দলের ব্যুহ বিদীর্ণ করিয়া বেগে ধাবিত হও দেখি! একবার দ্রুত সঞ্চালনে শ্রান্তি বোধ করিয়া মুক্তাবিনিন্দিত স্বেদবিন্দুসিক্ত কপালে ঘোমটা তুলিয়া দিয়া গগনগবাক্ষে স্থির দৃষ্টিতে বসিয়া বায়ু সেবন কর দেখি! একবার অজস্র সুধাবর্ষণ করিয়া চকোরচক্রের অপরিতৃপ্ত রসনার তৃপ্তি সাধন কর দেখি; একবার শুভক্ষণে কমলাকান্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হও, কমলাকান্ত শয়ন করিল।
শশী, তুমি ক্ষীরোদ-সাগরজা ত্রিভুবন-বিহারিণী হইয়াও বালিকা-স্বভাব-সুলভ অভিমানের ভজনা করিলে? কমলাকান্ত কোন্ দোষে দোষী বলিতে পারি না-কখন একবার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ-জটিলতা-জাল-চ্ছেদনার্থ উদাহরণচ্ছলে প্রসন্নর নাম করিয়াছিলাম বলিয়া এত অভিমান আজিকার রজনীতে ভাল দেখায় না। দেখ, তুমি কলঙ্কিনী, তবু আমি তোমাকে গ্রহণ করিলাম। তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া অদ্যাবধি Lunatic7 নাম ধরিলাম। জ্যোতির্বিদেরা বলিয়া থাকেন, তুমি পাষাণী-তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তাঁহারা বলেন, তোমাতে মনুষ্যত্ব নাই, তবু আমি তোমাকে বিবাহ করিলাম। তবু রাগ?-তবে এই সংসার-গরল-খণ্ডন, এই গিরি-তরু-শিরসি-মণ্ডন, ঐ কর-লেখা আমার মাথায় তুলিয়া দাও। পার যদি, ঐ অনন্তনীল বৃন্দাবনে, মেঘের ঘোমটা একবার টানিয়া, একবার রাই মানিনী হইয়া বসো ! আমি একবার স্ত্রীলোকের পায়ে ধরিয়া এ জড়জীবন সার্থক করিয়া লই।8 আজি আমি শত দোষে দোষী হইলেও তোমা হইতেই আমার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তুমি আমার চান্দ্রায়ণের চন্দ্র-ফলক ! আমার বৈতরণীর নবীন বৎস।
অমন করিলে আমি শত সহস্র বিবাহ করিব। এখন কমলাকান্ত নূতন বিবাহের রীতি পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছে। কমল এখন স্বয়ং বর, কর্ত্তা, পুরোহিত, ঘটক হইতে শিখিয়াছে। কমল এখন যেখানে সেখানে বিবাহ করিতে পারে। যখন দেখিব, নব পল্লবিকা শাখা-স্কন্ধ হইতে মুখ বাড়াইয়া করপত্র সঞ্চালনে আহ্বান করিতেছে, তখনই আমি তাহাকে বিবাহ করিব। যখন দেখিব, পদ্মমুখী স্বচ্ছ সরসী-দর্পণে আপনার মুখ বঙ্কিম গ্রীবায় নিরীক্ষণ করিয়া হাসিতেছে, তখনই আমি স্থলকমলে, জলকমলে মিশাইয়া দিব। যখন দেখিব, নির্ঝরিণী রামধনুক ধরিয়া আনিয়া তাহাই লোফালুফি করিয়া খেলা করিতেছে, তখনই তাহাকে সেই ধনুঃ স্পর্শ করাইয়া শপথ দিয়া আমার সঙ্গিনী করিয়া লইব। যখন দেখিব, অনন্ত শয্যায় স্বর্ণাদি মণিভূষায় শ্বেতাম্বরে ভূষিত হইয়া উত্তর দক্ষিণ শয়নে নিদ্রা যাইতেছে, তখনই তাহাকে পাণিগ্রহণে ধীরে ধীরে জাগরিত করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের ভাগিনী করিব। যখন দেখিব,

কুঞ্জলতা কাণে ঝুমকা দোলাইয়া শ্যাম চিকুররাশি চারি দিকে ছড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে মৃদু সৌর কিরণে ঈষত্তপ্ত হইতেছে, তখনই তাহার কেশগুচ্ছমধ্যে মস্তক সন্নিবেশিত করিয়া তাহার ঝুমকা সরাইয়া দিয়া তাহার বরকে চিনাইয়া দিব। কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী এখন বিবাহ করিতে শিখিল, ঘটকালী শিখিল, আর কাহারও উপাসনা করিবে না। যদি তোমরা আমার পরামর্শে শ্রদ্ধা কর, ত আমার মত বিবাহ কর–আমি বেশ ঘটকালী জানি, তোমাদের মনের মত সামগ্রী মিলাইয়া দিব।

———————————

5 বোধ হয়, এই রাত্রি হইতেই কমলাকান্তের বাতিকের বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছিল। –শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস।

6 হি শী কাহাকে বলে? শুনিয়াছি, দুইটি ইংরাজী সর্ব্বনাম–হি পুংলিঙ্গ–শী স্ত্রীলিঙ্গ। –শ্রীভীষ্মদেব। ইংরাজিমতে চন্দ্র শী। এখন উপায়? হি কি শী, তাহা স্থির হইবে কি প্রকারে?

7 চন্দ্রগ্রস্ত, চাঁদে পাওয়া বা পাগল।

8 আমি জানি, কমলাকান্ত এক দিন প্রসন্ন গোয়ালিনীর পায়ে ধরিয়াছেন। কিন্তু সে দুগ্ধের জন্য। –শ্রীভীষ্মদেব।

০৭. বসন্তের কোকিল

তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফুটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্প লাগে, তখন কোথায় থাক, বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজা মাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না-তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসী বাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়-কত টিকি, ফোঁটা, তেড়ি, চসমার হাট লাগিয়া যায়-কত কবিতা শ্লোক, গীত, হেটো ইংরেজি, মেটো ইংরেজি, চোরা ইংরেজি, ছেঁড়া ইংরেজিতে নসী বাবুর বৈঠকখানা পারাবত-কাকলি-সংকুল গৃহসৌধবৎ বিকৃত হইয়া উঠে। যখন তাঁহার বাড়ীতে নাচ, গান, যাত্রা, পর্ব্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া, তাঁহার ঘর বাড়ী আঁধার করিয়া তুলে-কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসী বাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল, তাঁহার সঙ্গে পিপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, আর নসী বাবুর পুত্রটি অকালে মৃত্যু হইল, তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও "অসুখ", এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ-একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না। আসল কথা, সে দিন বর্ষা, বসন্ত নহে, বসন্তের কোকিল সে দিন আসিবে কেন?

তা ভাই বসন্তের কোকিল, তোমার দোষ নাই, তুমি ডাক। ঐ অশোকের ডালে বসিয়া রাঙ্গা ফুলের রাশির মধ্যে কালো শরীর, জ্বলন্ত আগুনের মধ্যগত কালো বেগুনের মত, লুকাইয়া রাখিয়া, একবার তোমার ঐ পঞ্চম স্বরে, কু-উ বলিয়া ডাক। তোমার ঐ কু-উ রবটি আমি বড় ভালবাসি। তুমি নিজে কালো-পরান্নপ্রতিপালিত, তোমার চক্ষে সকলই "কু"-তবে যত পার, ঐ পঞ্চম স্বরে ডাকিয়া বল, "কু-উঃ"। যখন এ পৃথিবীতে এমন কিছু সুন্দর সামগ্রী দেখিবে যে , তাহাতে আমার দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষার উদয় হয়, তখনই উচ্চ ডালে বসিয়া ডাকিয়া বলিও, "কু-উ"-কেন না, তুমি সৌন্দর্য্যশূন্য, পরান্নপ্রতিপালিত। যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্প-স্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল-তখনই ডাকিয়া বলিও, "কু-উঃ"। যখনই দেখিবে, অসংখ্য গন্ধরাজ এককালে ফুটিয়া আপনাদিগের গন্ধে আপনারা বিভোর হইয়া, এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে, তখনই তোমার সেই ডাল হইতে ডাকিয়া বলিও, "কু-উঃ"। যখন দেখিবে, বকুলের অতি ঘনবিন্যস্ত মধুরশ্যামল স্নিগ্ধোজ্জ্বল পত্ররাশির শোভা আর গাছে ধরে না-পূর্ণযৌবনা সুন্দরীর লাবণ্যের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া, ভাসিয়া হেলিয়া দুলিয়া, ভাঙ্গিয়া গলিয়া, উছলিয়া উঠিতেছে, তাহার অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠিতেছে-তখন তাহারই আশ্রয়ে বসিয়া, সেই পাতার স্পর্শে অঙ্গ শীতল করিয়া, সেই গন্ধে দেহ পবিত্র করিয়া, সেই বকুলকুঞ্জ হইতে ডাকিও, এ "কু-উ"। যখন দেখিবে, শুভ্র-মুখী, শুদ্ধশরীরা, সুন্দরী নবমল্লিকা সন্ধ্যা-শিশিরে সিক্ত হইয়া, আলোক-প্রাখর্য্যের হ্রাস দেখিয়া ধীরে ধীরে মুখখানি খুলিতে সাহস করিতেছে-স্তরে স্তরে অসংখ্য অকলঙ্ক দল-রাজি বিকসিত

করিবার উপক্রম করিতেছে,-যখন দেখিবে যে, ভ্রমর সে রূপ দেখিয়া-"আদরেতে আগুসারি"-কন্ঠভরা গুনগুন্ মধু ঢালিয়া দিতেছে-তখন, হে কালামুখ ! আবার "কু-উঃ" বলিয়া ডাকিয়া মনের জ্বালা নিবাইও। আর যখনই গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণস্থ দাড়িম্বশাখায় বসিয়া দেখিবে, সেই গৃহপুষ্পরূপিণী কন্যাগণের সেই লতার দোলানি, সেই গন্ধরাজের প্রস্ফুটতা, সেই বকুলের রূপোচ্ছ্বাস, সেই মল্লিকার অমলতা, একাধারে মিলিত করিয়াছে, তখনই তাহাদের মুখের উপর, ঐ পঞ্চম-স্বরে, গৃহপ্রাচীর প্রতিধ্বনিত করিয়া সবাইকে ডাকিয়া বলিও, এত রূপ, এত সুখ, এত পবিত্রতা-এ "কু-উঃ"! ঐটি তোমার জিত-ঐ পঞ্চম-স্বর! নহিলে তোমার ও কু-উ কেহ শুনিত না। এ পৃথিবীতে গ্লাডষ্টোন, ডিস্রেলি প্রভৃতির ন্যায়-তুমি কেবল গলাবাজিতে জিতিয়া গেলে-নহিলে অত কালো চলিত না; তোমার চেয়ে হাঁড়িচাঁচা ভাল। গলাবাজির এত গুণ না থাকিলে, যিনি বাজে নবেল লিখিয়াছেন, তিনি রাজমন্ত্রী হইবেন কেন? আর জন ষ্টুয়ার্ট মিল পার্লিয়ামেন্টে স্থান পাইলেন না কেন?

তবে কোকিল, তুমি প্রকৃতির মহা-পার্লিয়ামেন্টে দাঁড়াইয়া নক্ষত্রময় নীলচন্দ্রাতপ-মণ্ডিত, গিরিনদীনগরকুঞ্জাদি বেঞ্চে সুসজ্জিত, ঐ মহাসভা-গৃহে, তোমার এ মধুর পঞ্চম-স্বরে-কু-উঃ বলিয়া ডাক-সিংহাসন হইতে হষ্টিংস পর্য্যন্ত সকলেই কাঁপিয়া উঠুক। "কু-উঃ"! ভাল, তাই; ও কলকন্ঠে কু বলিলে কু মানিব, সু বলিলে সু মানিব। কু বৈ কি? সব কু। লতায় কন্টক আছে; কুসুমে কীট আছে; গন্ধে বিষ আছে; পত্র শুষ্ক হয়, রূপ বিকৃত হয়, স্ত্রীজাতি বঞ্চনা জানে। কু-উঃ বটে-তুমি গাও। কিন্তু তুমি ঐ পঞ্চম-স্বরে কু বলিলেই কু মানিব-নচেৎ কুঁকড়ো বাবাজি "কু ক্কু কু কু" বলিয়া আমার সুখের প্রভাত-নিদ্রাকে কু বলিলে আমি মানিব না। তার গলা নাই। গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না; যদি শব্দ-মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে-বে-পর্দা বা কড়িমধ্যমের কাজ নয়। সর্ জেমস্ মাকিন্টশ্, তাঁহার বক্তৃতায় ফিলজফির9 কড়িমধ্যম মিশাইয়া হারিয়া গেলেন-আর মেকলে রেটরিকের10 পঞ্চম লাগাইয়া জিতিয়া গেলেন। ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন-কবিকঙ্কণের ঋষভস্বর কে শুনে? দেখ, লোকের বৃদ্ধ পিতা-মাতার বেসুরো বকাবকিতে কোন্ ফল দর্শে? আর যখন বাবুর গৃহিণী বাবুর সুর বাঁধিয়া দিবার জন্য বাবুর কাণ টিপিয়া ধরিয়া পঞ্চমে গলার আওয়াজ দেন, তখন বাবু পিড়িং-পিড়িং বলেন, কি না?

তবে তোমার স্বরকে পঞ্চম স্বর কেন বলে, তাহা বুঝি না। যাহা মিষ্ট তাহাই পঞ্চম? দুইটি পঞ্চম মিষ্ট বটে,-সুরের পঞ্চম, আর আলতাপরা ছোট পায়ের গুজরী পঞ্চম। তবে, সুর, পঞ্চমে উঠিলেই মিষ্ট; পায়ের পঞ্চম, পা হইতে নামাইলেই মিষ্ট।

কোন্ স্বর পঞ্চম, কোন্ স্বর সপ্তম, কে মধ্যম, কে গান্ধার, আমাকে কে বুঝাইয়া দিবে? এটি হাতীর ডাক, ওটি ঘোড়ার ডাক, সেটি ময়ূরের কেকা, ওটি বানরের কিচিমিচি, এ বলিলে ত কিছু বুঝিতে পারি না। আমি আফিংখোর-বেসুরো শুনি, বেসুরো বুঝি, বেসুরো লিখি-ধৈবত গান্ধার নিষাদ পঞ্চমের কি ধার ধারি? যদি কেহ পাখোয়াজ তানপুরা দাড়ি দাঁত লইয়া আমাকে সপ্ত সুর বুঝাইতে আসে, তবে তাহার গর্জ্জন শুনিয়া মঙ্গলা গাইয়ের সদ্যপ্রসূত বৎসের ধ্বনি আমার মনে পড়ে-তাহার পীতাবশিষ্ট নির্জ্জল দুগ্ধের অনুধ্যানে মন ব্যস্ত হয়-সুর বুঝা হয় না। আমি গায়কের নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তিনি জন্মান্তরে মঙ্গলার বৎস হন।

এখন আয়, পাখী! তোতে আমাতে একবার পঞ্চম গাই। তুইও যে, আমিও সে-সমান দুঃখের দুঃখী,

সমান সুখের সুখী। তুই এই পুষ্পকাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়া বেড়াস্-আমিও এই সংসার-কাননে, গৃহে গৃহে, আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই-আয়, ভাই, তোতে আমাতে মিলে মিশে পঞ্চম গাই। তোরও কেহ নাই-আনন্দ আছে, আমারও কেহ নাই-আনন্দ আছে। তোর পুঁজিপাটা ঐ গলা; আমার পুঁজিপাটা এই আফিঙ্গের ডেলা; তুই এ সংসারে পঞ্চম স্বর ভালবাসিস্-আমিও তাই; তুই পঞ্চম স্বরে কারে ডাকিস? আমিই বা কারে? বল্ দেখি, পাখী, কারে?

যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি। আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস্। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা; তুইও কিছু জানিস্ না, আমিও জানিও না; তোরও ডাক পৌঁছিবে, আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর আমার ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয়, ভাই, একবার মিলে মিশে দুই জনে পঞ্চম-স্বরে ডাকি।

তবে, কুহুরবে সাধা গলায়, কোকিল একবার ডাক্ দেখি রে! কণ্ঠ নাই বলিয়া আমার মনের কথা কখন বলিতে পাইলাম না। যদি তোর ও ভুবন-ভুলান স্বর পাইতাম, ত বলিতাম। তুই আমার সেই মনের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়া এই পুষ্পময় কুঞ্জবনে একবার ডাক্ দেখি রে! কি কথাটি বলিব বলিব মনে করি, বলিতে জানি না, সেই কথাটি তুই বল্ দেখি রে! কমলাকান্তের মনের কথা, এ জন্মে বলা হইল না-যদি কোকিলের কণ্ঠ পাই-অমানুষী ভাষা পাই, আর নক্ষত্রদিগকে শ্রোতা পাই, তবে মনের কথা বলি। ঐ নীলাম্বরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, ঐ নক্ষত্রমণ্ডলীমধ্যে উড়িয়া, কখন কি কুহু বলিয়া ডাকিতে পাইব না? আমি না পাই, তুই কোকিল আমার হয়ে একবার ডাক্ দেখি রে?

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

০৮. স্ত্রীলোকের রূপ

অনেক ভামিনী রূপের গৌরবে পা মাটিতে দেন না। ভাবেন, যে দিক্ দিয়া অঙ্গ দোলাইয়া চলিয়া যান, লাবণ্যের তরঙ্গে সে দিকের সংজ্ঞা ডুবিয়া যায়; নূতন জগতের সৃষ্টি হয়। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের রূপের ঝড় যে দিকে বয়, সে দিকে সকলের ধৈর্য্য-চলা উড়িয়া যায়, ধর্ম্ম-কোটা ভাঙ্গিয়া পড়ে; যখন পুরুষের মন-চড়ায় তাঁহাদের রূপের বান ডাকে, তখন তাঁহাদের কর্ম্ম-জাহাজ; ধর্ম্ম-পান্সী, সিদ্ধি-ডিঙ্গি, সব ভাঙ্গিয়া যায়। কেবল সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনীকূলেরই এইরূপ প্রতীতি নহে; পুরুষেরাও যখন মহিলাগণের মোহিনী শক্তির বশীভূত হইয়া তাহাদিগের রূপের মহিমা বর্ণনারম্ভ করেন, তখন যে তাঁহারাও কি বলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তখন গগনের জ্যোতিষ্ক, পৃথিবীর পর্ব্বত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, লতা গুল্মাদি সকলকেই লইয়া উপমার জন্য টানাটানি পাড়ান-আবার অনেককেই অপমানিত করিয়া পাঠান। রূপসীর মুখমণ্ডলের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহারা পূর্ণশশীকে নিমন্ত্রণ করিয়া আবার মসীবৎ ম্লান বলিয়া ফেরৎ পাঠান; গরিব চাঁদ, আপনার কলঙ্ক আপনি বুকে করিয়া রাতারাতি আকাশের কাজ সারিয়া পলায়ন করে। সুন্দরীর ললাটের সিন্দুরবিন্দু দেখিয়া তাঁহারা ঊষার সীমন্ত-শোভা তরুণ তপনের নিন্দা করেন; রাগে সূর্য্যদেব, পৃথিবী দগ্ধ করিয়া চলিয়া যান। রসময়ীর আস্যের হাস্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল কমলে সৌর-রশ্মির লাস্য বা বিকসিত কুমুদে কৌমুদীর নৃত্য তাঁহারা আর ভালবাসেন না; সেই অবধি কমল কুমুদে কীট-পতঙ্গের অধিকার। কামিনীর কন্ঠহার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহারা নিশার তারকামালার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করেন; বোধ করি, ভবিষ্যতে জ্যোতিষের অনুশীলন ত্যাগ করিয়া, তাঁহারা স্বর্ণকারের বিদ্যায় মন দিবেন। রঙ্গিণীর শরীরসঞ্চালনে তাঁহারা এত লাবণ্যলীলা বিলোকন করেন যে, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মন্দ মন্দ আন্দোলিত বৃক্ষপত্রে বা নিয়ত কম্পিত সিন্ধুহিল্লোলে চন্দ্রিকার খেলায় তাঁহাদিগের আর মন উঠে না। এই জন্যই বা, রাত্রে নিদ্রা যান, এবং নদীকে কলসী কলসী করিয়া শুষিতে থাকেন। আবার যখন রমণীর নয়ন বর্ণন করেন, তখন সরোবরে মলয়-মারুতে দোদুল্যমান নীলোৎপল দূরে থাকুক, বিশ্বমণ্ডলের কিছুই তাঁহাদিগের ভাল লাগে না।

এই নারীমূর্ত্তির স্তাবককূলের উপমানুভবশক্তির কিছু প্রশংসা করিতে হয়। এক চক্ষু তাঁহাদিগের কল্পনাপ্রভাবে কখন পক্ষী, যথা খঞ্জন, চকোর; কখন মৎস্য, যথা সফরী; কখন উদ্ভিদ্, যথা পদ্ম, পদ্মপলাশ, ইন্দীবর; কখন জড় পদার্থ, যথা আকাশের তারা। এক চন্দ্র, কখনও রমণীর মুখমণ্ডল, কখনও তাহার পায়ের নখর। 11 উচ্চ কৈলাস-শিখর, এবং ক্ষুদ্র কোমল কোরক, একেরই উপমাস্থল; কিন্তু ইহাতেও কুলায় না বলিয়া দাড়িম্ব, কদম্ব, করিকুম্ভ এই বিষম উপমাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে। জলচর ক্ষুদ্র পক্ষী হংস, এবং স্থলচর প্রকাণ্ড চতুষ্পদ হস্তী, ইহাদিগের গমনে বৈষম্য থাকাই স্বাভাবিক উপলব্ধি; কিন্তু কবিদিগের চক্ষে উভয়েই রমণী-কুল-চরণ-বিন্যাসের অনুকারী। আবার যে সে হাতীর গমনের সহিত, এই হংসগামিনীদিগের গমনসাদৃশ্য নির্দ্দেশ করা বিধেয় নহে; যে হাতী হাতীর রাজা, সেই হাতীর সঙ্গেই গজেন্দ্রগামিনীগণের গতি তুলনীয়। শুনিয়াছি, হাতী এক দিনে অনেক দূর যাইতে পারে; অশ্বাদি কোন পশু তত পারে না। যাঁহাদিগকে দূরে যাইতে হয়, তাঁহারা এই গজেন্দ্রগামিনীদিগের পিঠে চড়িয়া যান না কেন? যে দিকে রেলওয়ে হয় নাই, সে দিকে বাছিয়া বাছিয়া গজগামিনী মেয়ের ডাক বসাইলে কেমন হয়?

আমিও এক কালে কামিনীভক্ত কবিদলভুক্ত ছিলাম। আমি তখন এই অখিল সংসারে রমণীর ন্যায় সুন্দর বস্তু আর দেখিতে পাইতাম না। চম্পক, কমল, কুন্দ, বন্ধুজীব, শিরীষ, কদম্ব, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পচয় তখন কামিনী-কান্তি-গ্রথিত কুসুম-মালিকার ন্যায় মনোহর বোধ হইত না। বলিতে কি, বসন্তের কুসুমবতী বসুমতী অপেক্ষাও আমি কুসুমময়ী মহিলাকে ভালবাসিতাম; বর্ষার উচ্ছ্বসিত-সলিলা চিররঙ্গিণী তরঙ্গিণী অপেক্ষাও রসবতী যুবতীর পক্ষপাতী ছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আর আমার সে ভাব নাই। আমার দিব্যজ্ঞান হইয়াছে। আমি মায়াময়ী মানবীমণ্ডলের কুহক-জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পলায়ন করিয়াছি। জালিয়ার পচা জালে রাঘব বোয়াল পড়িলে, যেমন জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; ক্ষুদ্র মাকড়সার জালে যেমন গুবরে পোকা পড়িলে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করে, আমি তেমনি পলায়ন করিয়াছি; দুরন্ত গোরু একবার দড়ি ছিঁড়িতে পারিলে যেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, আমি তেমনি দৌড় মারিয়া পলায়ন করিয়াছি। সকলই আফিমের প্রসাদে। হে মাতঃ আফিম দেবি! তোমার কৌটা অক্ষয় হউক। তুমি বৎসর বৎসর সোণার জাহাজে চড়িয়া চীনদেশে পূজা খাইতে যাও! জাপান, সাইবেরিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, সকলই তোমার অধিকারভুক্ত হউক; তোমার নামে দেশে দেশে দুর্গোৎসব হউক। কমলাকান্তকে পায়ে রাখিও। আমি তোমার কৃপায় সাধারণের উপকারার্থে নিজের মন খুলিয়া দুই চারিটি কথা বলিব।

কথা শুনিয়া কেবল স্ত্রীলোক কেন, অনেক পুরুষেও আমাকে পাগল বলিবেন। বলুন, ক্ষতি নাই। নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়। গালিলিও12 ইতালীয় ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্, সমাজ শুনিয়া হাসিলেন; শুনিয়া স্থির করিলেন, গালিলিওর মতিভ্রম হইয়াছে। কালের স্রোত বহিয়া গেল। ইতালীর ভদ্র সমাজ, ধার্ম্মিক সমাজ, বিদ্বান্ সমাজ আর পৃথিবী ঘুরিতেছে শুনিলে হাসেন না; গালিলিওকে আর মতিভ্রান্ত জ্ঞান করেন না।

সকলে সৌন্দর্য্য বিষয়ে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য স্বীকার করেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার পাইয়াও, রূপের টিকা স্ত্রীলোকের মস্তকে দেন। আমার বিবেচনায় এটি মস্ত ভুল। আমি দিব্য চক্ষে দেখিয়াছি যে, পুরুষের রূপ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের রূপ অনেক দূর নিকৃষ্ট। হে মানময়ী মোহিনীগণ! কুটিল কটাক্ষে কালকূট বর্ষণ করিয়া আমাকে এই দোষে দগ্ধ করিও না; কালসর্পী-বিনিন্দিত বেণীদ্বারা আমাকে বন্ধন করিও না, ভ্রূধনুতে কোপে তীক্ষ্ণ শর যোজনা করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিও না। বলিতে কি, তোমাদের নিন্দা করিতে ভয় করে। পথ বুঝিয়া যদি তোমরা নথ-ফাঁদ পাতিয়া রাখ, তবে কত হস্তী বদ্ধচরণ হইয়া, তোমাদের নাকে ঝুলিতে পারে-কমলাকান্ত কোন্ ছার! তোমাদের নথের নোলক খসিয়া পড়িলে, মানুষ খুন হইবার অনেক সম্ভাবনা; চন্দ্রহারের একখানি চাঁদ যদি স্থানচ্যুত হইয়া কাহারও গায়ে লাগে, তবে তাহার হাত পা ভাঙ্গা বিচিত্র নহে। অতএব তোমরা রাগ করিও না। আর হে রমণীপ্রিয়, কল্পনাপ্রিয়, উপমাপ্রিয় কবিগণ, তোমাদিগের স্ত্রীদেবীর সুখময়ী সুবর্ণময়ী প্রতিমা ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তোমরা আমাকে মারিতে উদ্যত হইও না। আমি সপ্রমাণ করিয়া দিব যে, তোমারা কুসংস্কারবিষ্ট পৌত্তলিক। তোমরা উপাস্য দেবতার প্রকৃত মূর্ত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃত প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিতেছ।

যাহার সুন্দর কেশপাশ আছে, সে আর পরচুলা ব্যবহার করে না। যাহার উজ্জ্বল ভাল দাঁত আছে, তাহার কৃত্রিম দন্তের প্রয়োজন হয় না। যাহার বর্ণে লোকের মন হরণ করে, তাহার আর রং মাখিয়া লাবণ্য বৃদ্ধি করিতে হয় না। যাহার নয়ন আছে, তাহার আর কাচের চক্ষুর আশ্রয় লইতে হয় না।

যাহার চরণ আছে, তাহাকে আর কাষ্ঠপদ অবলম্বন করিতে হয় না। এইরূপ যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহার জন্য লালায়িত হয় না। যে বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি কোন পদার্থে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই তদ্বিষয়ে আপনার অভাব মোচনার্থ যত্ন করিয়া থাকে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অত্যন্ত অভাব। তাহারা সর্ব্বদা আপন আপন রূপ বাড়াইতে ব্যস্ত; কি উপায়ে আপনাকে সুন্দরী দেখাইবে, ইহা লইয়াই উন্মাদিনী; ভাল ভাল অলঙ্কার কিসে পাইবে, নিয়ত ইহাই তাহাদিগের ভাবনা, ইহাই তাহাদিগের চেষ্টা; এমন কি বলা যাইতে পারে যে, অলঙ্কারই তাহাদিগের জপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের তপ, অলঙ্কারই তাহাদিগের ধ্যান, অলঙ্কারই তাহাদিগের জ্ঞান। স্বীয় দেহ সজ্জিত করিতে এত যাহাদিগের যত্ন, তাহাদিগের প্রকৃত সৌন্দর্য্য যে অধিক আছে, এরূপ বোধ হয় না। যাহার নাক সুন্দর নহে, সেই নাকে নথরূপ রজ্জুতে নোলক জগন্নাথকে দোলায়; যাহার কাণ সুন্দর নহে, সেই ঢাকাই-কানরূপ নানা ফলফুল পশুপক্ষিবিশিষ্ট বাগানের যোড়া কাণে ঝুলাইয়া দেয়। যাহার হৃদয় ভাল নহে, সেই সেখানে সাতনর ফাঁসির দড়ি টাঙ্গাইয়া পুরুষজাতির, বিশেষতঃ স্তন্যপায়ী বালকদিগের ভীতি বিধান করে। যে অলঙ্কার বিনাও আপনাকে সুন্দরী বলিয়া জানে, সে কখন অলঙ্কারের বোঝা বহিতে এত ব্যগ্র হয় না। পুরুষে ভূষণ বিনা সন্তুষ্ট থাকে; স্ত্রীলোক ভূষণ বিনা মনুষ্যসমাজে মুখ দেখাইতে লজ্জা পায়। অতএব স্ত্রীলোকদিগের নিজের ব্যবহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীজাতি সৌন্দর্য্যবিষয়ে নিকৃষ্ট।
স্ত্রীজাতি অপেক্ষা যে পুরুষজাতির সৌন্দর্য্য অধিক, প্রকৃতির সৃষ্টি-পদ্ধতি সমালোচনা করিয়া দেখিলে আরও স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। যে বিস্তীর্ণ চন্দ্রকলাপ দেখিয়া জলদমুকুট ইন্দ্রধনু হারি মানে, সে চন্দ্রকলাপ ময়ূরের আছে; ময়ূরীর নাই। যে কেশরে সিংহের এত শোভা, তাহা সিংহীর নাই। যে ঝুটিতে বৃষভের কান্তি বৃদ্ধি করে, গাভীর তাহা নাই। কুক্কুটের যেমন সুন্দর তাম্রচূড়া ও পক্ষ সকল আছে, কুক্কুটীর তেমন নাই। এইরূপ দেখিতে পাইবে যে, উচ্চ শ্রেণীর জীবদিগের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সুশ্রী। মনুষ্য সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। হে মূল "বিদ্যাসুন্দর"কার! তোমার মনে কি এই তত্ত্বটি উদিত হইয়াছিল? এজন্যই কি তুমি নায়কের নাম সুন্দর রাখিয়াছিলে? তুমি কি বুঝিয়াছিলে যে, স্ত্রীলোক যত কেন বিদ্যাবতী হউক না, পুরুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ও বুদ্ধির নিকটে তাহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবে।
সৌন্দর্য্যের বাহার যৌবনকালে। কিন্তু, রূপান্ধ ভামিনীগণ! তোমাদিগের যৌবন কতক্ষণ থাকে? জোয়ারের জলের মত আসিতে আসিতেই যায়। কুড়ি হইতেই তোমরা বুর্য্যড়ী হইলে। অল্প দিনের মধ্যেই তোমাদিগের অঙ্গ সকল শিথিল হইয়া পড়ে। বয়স আসিয়া শীঘ্রই তোমাদিগের গলার লাবণ্য-মালা ছিঁড়িয়া লয়। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশে পুরুষের যে শ্রী থাকে, বিশ পঁচিশের ঊর্দ্ধে তোমাদিগের তাহা থাকে না। তোমাদিগের রূপের স্থিতি সৌদামিনীর ন্যায়, ইন্দ্রধনুর ন্যায়, মুহূর্ত্তের জন্য না এ হউক, অত্যল্প কালের জন্য সন্দেহ নাই। যাহারা রূপোপভোগে উন্মত্ত, আমি আহারে বসিলেই তাহাদের যন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারি;-আমার জীবনে ঘোর দুঃখ এই যে, অন্ন ব্যঞ্জন পাতে দিতে দিতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। তেমনি, স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যরূপ বুকড়ি চালের ভাত, প্রণয়-কলাপাতে ঢালিতে ঢালিতে ঠাণ্ডা হইয়া যায়-আর কাহার সাধ্য খায়? শেষে বেশভূষারূপ তেঁতুল মাখিয়া, একটু আদর-লবণের ছিটা দিয়া কোনরূপে গলাধঃকরণ করিতে হয়।
হে সৌন্দর্য্যগর্ব্বিত কামিনীফুল! সত্য করিয়া বল দেখি, এই রূপ ক্ষণস্থায়ী বলিয়াই কি তোমাদিগের

রূপের এত আদর? ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে, ভাল করিয়া উপভোগ করিতে না করিতে অন্তর্হিত হইয়া যায় বলিয়া, তোমাদিগের রূপের জন্য কি পুরুষেরা পিপাসিত চাতকের ন্যায় উন্মত্ত? অপরিজ্ঞাত হারাধন বলিয়াই কি তোমরা উহার প্রকৃত মূল্য নির্ণয় অশক্ত? কেবল ক্ষণস্থায়ী পদার্থ বলিয়া নয়, অপর কারণেও স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করে। যে সকল গ্রন্থকারদিগের মত ভূমণ্ডলে গ্রাহ্য হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই পুরুষ, এ কারণে আমার বিবেচনায় অনুরাগনেত্রে কামিনীকুলের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কথাই আছে, "যার যাতে মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।" যে রমণীগণ প্রণয়ের পদার্থ, তাহাদিগকে কে সহজ চক্ষুতে দেখিবে? সুন্দর মুকুরের প্রভাবে দৃষ্ট বস্তু কুৎসিত হইলেও সুন্দর দেখাইবে। মনোমোহিনীর রূপ নিরীক্ষণকালে তাহাতে প্রীতির অঞ্জনে মাখাইয়া দেখিব। পুরুষাপেক্ষা তাহার মাধুর্য্য কেন না অধিক বোধ হইবে?

হে প্রণয়দেব, পাশ্চাত্য কবিরা তোমাকে অন্ধ বলিয়াছেন। কথাটা মিথ্যা নয়। তোমার প্রভাবে লোকে প্রিয় বস্তুর দোষ দেখিতে পায় না। তোমার অঞ্জনে যাহার নেত্র রঞ্জিত হইয়াছে সে বিশ্বমোহন পদার্থ-পরম্পরায় পরিবৃত থাকে। বিকট মূর্ত্তিকে সে মনোহর দেখে। কর্কশ স্বরকে সে মধুময় ভাবে। প্রেতিনীর অঙ্গ-ভঙ্গীকে মৃদু-মন্দ মলয়-মারুতে দোদুল্যমানা ললিতলবঙ্গতার লাবণ্যলীলা অপেক্ষাও সুখকরী জ্ঞান করে। এজন্যই চীনদেশে খাঁদা নাকের আদর। এজন্যই বিলাতী বিবিদের রাঙ্গা চুল ও বিড়াল চোখের আদর। এজন্যই কাফ্রিদেশে স্থূল ওষ্ঠাধরের আদর। এজন্যই বাঙ্গালাদেশে উল্কি-চিত্রিত মিশি কলঙ্কিত চাঁদবদনের আদর। এজন্যই মানবসমাজে স্ত্রীরূপের আদর। আর যদি স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় মনের কথা মুখে আনিতেন, তাহা হইলে, হে প্রণয়দেব, নিজের গুণে হউক না হউক, অন্ততঃ তোমার গুণেও আমরা শুনিতে পাইতাম যে, পুরুষের সৌন্দর্য্যের কাছে স্ত্রীলোকের রূপ কিছুই নয়। যদিও অন্তরের গুপ্ত ভাব বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করিতে মহিলাগণ অত্যন্ত সঙ্কুচিতা, তথাপি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের আন্তরিক গূঢ় তত্বগুলি কিয়ৎপরিমাণে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কে না দেখিয়াছে যে, সুন্দরীরা পরস্পরের সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে চাহেন না, অথচ পুরুষের ভক্ত হইয়া বসেন? ইহাতে কি বুঝিয়াইতেছে না যে, মনে মনে তাঁহারা স্ত্রীলোকের রূপাপেক্ষা পুরুষের রূপের পক্ষপাতিনী?

রূপ, রূপ, করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সকলেই ভাবে, রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব। সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তুর প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে চায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবারমধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদমণ্ডলীর একমাত্র সম্বল, সংসার-সাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, এ কথা আর আমি শুনিতে চাহি না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে কোটী গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি। যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত আত্মীয়বর্গের সেবা শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা কামিনীকুলের সহিষ্ণুতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতি পুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন, ধর্ম্মের জন্য বাহ্যসুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে, সহমরণপ্রবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে, পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গে প্রবেশ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামিচরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষণ নাই। আনন প্রফুল্ল। ক্রমে পাবকশিখা বাড়িল, জীবন ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা। ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি! যখন আমি ভাবি যে, কিছু দিন হইল, আমাদিগের দেশীয়া অবলা অঙ্গনাগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ –তোমরা এ বঙ্গদেশের সার রত্ন! তোমাদের মিছা রূপের বড়াইয়ের কাজ কি?

—————————-

11 আমার বিবেচনায় চন্দ্রের সহিত নখরের তুলনা অতি সুন্দর-কেন না, উত্তম পদবিন্যাস হইতে পারে-যথা, নখর-হিমকর-করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জকুটীরে।-এটি আমার নিজের রচনা। -শ্রীভীষ্মদেব।

12 কাপর্নিকস্ P.D.

০৯. ফুলের বিবাহ

বৈশাখ মাস বিবাহের মাস। আমি ১লা বৈশাখে নসী বাবুর ফুলবাগানে বসিয়া একটি বিবাহ দেখিলাম। ভবিষ্যৎ বরকন্যাদিগের শিক্ষার্থ লিখিয়া রাখিতেছি। মল্লিকা ফুলের বিবাহ। বৈকাল-শৈশব অবসানপ্রায়, কলিকা-কন্যা বিবাহযোগ্য হইয়া আসিল। কন্যার পিতা বড় লোক নহে, ক্ষুদ্র বৃক্ষ, তাহাতে আবার অনেকগুলি কন্যাভারগ্রস্ত। সম্বন্ধের অনেক কথা হইতেছিল, কিন্তু কোনটা স্থির হয় নাই। উদ্যানের রাজা স্থলপদ্ম নির্দোষ পাত্র বটে, কিন্তু ঘর বড় উঁচু, স্থলপদ্ম অত দূর নামিল না। জবা এ বিবাহে অসম্মত ছিল না, কিন্তু জবা বড় রাগী, কন্যাকর্ত্তা পিছাইলেন। গন্ধরাজ পাত্র ভাল, কিন্তু বড় দেমাগ, প্রায় তাঁহার বার পাওয়া যায় না। এইরূপ অব্যবস্থার সময়ে ভ্রমররাজ ঘটক হইয়া মল্লিকা-বৃক্ষসদনে উপস্থিত হইলেন। তিনি আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্ মেয়ে আছে?" মল্লিকাবৃক্ষ পাতা নাড়িয়া সায় দিলেন, "আছে! ভ্রমর পত্রাসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! গুণ্ গুণাগুণ্! মেয়ে দেখিব।" বৃক্ষ, শাখা নত করিয়া, মুদিতনয়না অবগুণ্ঠনবতী কন্যা দেখাইলেন। ভ্রমর একবার বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া বলিলেন, "গুণ্! গুণ্! গুণ্! গুণ দেখিতে চাই। ঘোমটা খোল।" লজ্জাশীলা কন্যা কিছুতেই ঘোমটা খুলে না। বৃক্ষ বলিলেন, "আমার মেয়েগুলি বড় লাজুক। তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি মুখ দেখাইতেছি।" ভ্রমর ভোঁ করিয়া স্থলপদ্মের বৈঠকখানায় গিয়া রাজপুত্রের সঙ্গে ইয়ার্কি করিতে বসিলেন। এদিকে মল্লিকার সন্ধ্যাঠাকুরাণী-দিদি আসিয়া তাহাকে কত বুঝাইতে লাগিল -বলিল, "দিদি, একবার ঘোমটা খোল-নইলে, বর আসিবে না-লক্ষ্মী আমার, চাঁদ আমার সোণা আমার, ইত্যাদি।" কলিকা কত বার ঘাড় নাড়িল, কতবার রাগ করিয়া মুখ ঘুরাইল, কত বার বলিল, "ঠানদিদি, তুই যা! কিন্তু শেষে সন্ধ্যার স্নিগ্ধ স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া মুখ খুলিল। তখন ঘটক মহাশয় ভোঁ করিয়া রাজবাড়ী হইতে নামিয়া আসিয়া ঘটাকালীতে মন দিলেন। কন্যার পরিমলে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন, "গুণ্ গুণ্ গুণ্, গুণ্ গুণাগুণ্! কন্যা গুণবতী বটে। ঘরে মধু কত?" কন্যাকর্ত্তা বৃক্ষ বলিলেন, "ফর্দ্দ দিবেন, কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিব।" ভ্রমর বলিলেন, "গুণ্ গুণ্, আপনার অনেক গুণ-ঘটকালীটা?" কন্যাকর্ত্তা শাখা নাড়িয়া সায় দিল, "তাও হবে।" ভ্রমর-"বলি ঘটকালীর কিছু আগাম দিলে হয় না? নগদ দান বড় গুণ্-গুণ্ গুণ্ গুণ্।" ক্ষুদ্র বৃক্ষটি তখন বিরক্ত হইয়া, সকল শাখা নাড়িয়া বলিল, "আগে বরের কথা বল -বর কে?" ভ্রমর-"বর অতি সুপাত্র।-তাঁর অনেক গুণ-ন-ন্।" কে "তিনি?" গোলাবলাল গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর অনেক-গুণ-ন্-ন্।" সকল কথোপথন মনুষ্যে শুনিতে পায় না, আমি কেবল আফিমপ্রসাদাৎ দিব্য কর্ণ পাইয়াই এ সকল শুনিতেছিলাম। আমি শুনিতে লাগিলাম, কুলাচার্য্য মহাশয়, পাখা ঝাড়িয়া, ছয় পা ছড়াইয়া গোলাবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন যে, গোলাব বংশ বড় কুলীন; কেন না, ইহারা "ফুলে" মেল। যদি বল, সকল ফুলই ফুলে, তথাপি গোলাবের গৌরব অধিক; কেন না, ইহারা সাক্ষাৎ বাগ্মামালীর সন্তান; তাহার স্বহস্তরোপিত। যদি বল, এ ফুলে কাঁটা আছে, কোন্ কুলে বা কোন্ ফুলে নাই? যাহা হউক, ঘটকরাজ কোনরূপে সম্বন্ধ স্থির করিয়া বোঁ করিয়া উড়িয়া গিয়া, গোলাব বাবুর বাড়ীতে খবর দিলেন। গোলাব, তখন বাতাসের সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া, হাসিয়া, হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া খেলা করিতেছিল, বিবাহের নাম শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া কন্যার বয়স জিজ্ঞাসা করিল। ভ্রমর বলিল, "আজি কালি ফুটিবে।" গোধূলি লগ্ন উপস্থিত, গোলাব বিবাহে যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। উচ্চিঙ্গড়া, নহবৎ বাজাইতে আরম্ভ করিল; মৌমাছি সানাইয়ের বায়না লইয়াছিল, কিন্তু রাতকাণা বলিয়া সঙ্গে যাইতে পারিল না। খদ্যোতেরা ঝাড় ধরিল, আকাশে তারাবাজি হইতে লাগিল। কোকিল আগে আগে ফুকরাইতে লাগিল। অনেক বরযাত্রী চলিল, স্বয়ং রাজকুমার স্থলপদ্ম দিবাবসানে অসুস্থকর বলিয়া আসিতে পারিলেন না, কিন্তু জবাগোষ্ঠী-শ্বেত জবা, রক্ত জবা, জরদ জবা প্রভৃতি সবংশে আসিয়াছিল।

করবীদের দল, সেকেলে রাজাদিগের মত বড় উচ্চ ডালে চড়িয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। সেঁউতি নীতবর হইবে বলিয়া, সাজিয়া আসিয়া দুলিতে লাগিল। গরদের জোড় পরিয়া চাঁপা আসিয়া দাঁড়াইল-বেটা ব্রাণ্ডি টানিয়া আসিয়াছিল, উগ্র গন্ধ ছুটিতে লাগিল। গন্ধরাজেরা বড় বাহার দিয়া, দলে দলে আসিয়া, গন্ধ বিলাইয়া দেশ মাতাইতে লাগিল। অশোক নেশায় লাল হইয়া আসিয়া উপস্থিত; সঙ্গে এক পাল পিঁপ্‌ড়া মোসায়েব হইয়া আসিয়াছে; তাহাদের গুণের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, কিন্তু দাঁতের জ্বালা বড়-কোন্ বিবাহে না এরূপ বরযাত্রী জোটে, আর কোন্ বিবাহে না তাহারা হুল ফুটাইয়া বিবাদ বাধায়? কুরুবক, কুটজ প্রভৃতি আরও অনেক বরযাত্রী আসিয়াছিলেন, ঘটক মহাশয়ের কাছে তাঁহাদের পরিচয় শুনিবেন। সর্ব্বত্রই তিনি যাতায়াত করেন এবং কিছু কিছু মধু পাইয়া থাকেন। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল, আমিও গেলাম। দেখি, বরপক্ষের বড় বিপদ্। বাতাস বাহকের বায়না লইয়াছিলেন; তখন হুঁ-হুম্ করিয়া অনেক মরদানি করিয়াছিলেন, কিন্তু কাজের সময় কোথায় লুকাইলেন, কেহ খুঁজিয়া পায় না। দেখিলাম; বর বরযাত্রী, সকলে অবাক্ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। মল্লিকাদিগের কুল যায় দেখিয়া, আমিই বাহকের কার্য্য স্বীকার করিলাম। বর, বরযাত্রী সকলকে তুলিয়া লইয়া মল্লিকাপুরে গেলাম। সেখানে দেখিলাম, কন্যাকুল, সকল ভগিনী, আহ্লাদে ঘোমটা খুলিয়া, মুখ ফুটাইয়া পরিমল ছুটাইয়া, সুখের হাসি হাসিতেছে। দেখিলাম, পাতায় পাতায় জড়াজড়ি, গন্ধের ভাণ্ডারে ছড়াছড়ি পড়িয়া গিয়াছে-রূপের ভরে সকলে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। যূথি, মালতী, বকুল, রজনীগন্ধা প্রভৃতি এয়োগণ স্ত্রী-আচার করিয়া বরণ করিল। দেখিলাম, পুরোহিত উপস্থিত; নসী বাবুর নবমবর্ষীয়া কন্যা (জীবন্ত কুসুমরূপিণী) কুসুমলতা সূচ সূতা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে; কন্যাকর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করিলেন; পুরোহিত মহাশয় দুই জনকে এক সূতায় গাঁথিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিলেন। তখন বরকে বাসর-ঘরে লইয়া গেল। কত যে রসময়ী মধুময়ী সুন্দরী সেখানে বরকে ঘেরিয়া বসিল, তাহা কি বলিব। প্রাচীনা ঠাকুরাণীদিদি টগর সাদা প্রাণে বাঁধা রসিকতা করিতে করিতে শুকাইয়া উঠিলেন। রঙ্গণের রাঙ্গামুখে হাসি ধরে না। যূই কন্যের সই, কন্যের কাছে গিয়া শুইল; রজনীগন্ধাকে বর তাড়কা রাক্ষসী বলিয়া কত তামাসা করিল; বকুল একে বালিকা, তাতে যত গুণ, তত রূপ নহে; এক কোণে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; আর ঝুমকা ফুল বড় মানুষের গৃহিণীর মত মোটা মাগী নীল শাড়ি ছড়াইয়া জমকাইয়া বসিল। তখন- "কমলকাকা-ওঠ বাড়ী যাই-রাত হয়েছে, ও কি, ঢুলে পড়বে যে?" কুসুমলতা এই কথা বলিয়া আমার গা ঠেলিতেছিল; চমক হইলে, দেখিলাম কিছুই নাই। সেই পুষ্পবাসর কোথায় মিশিল? -মনে করিলাম, সংসার অনিত্যই বটে-এই আছে, এই নাই। সে রম্য বাসর কোথায় গেল,-সেই হাস্যমুখী শুভ্রস্মিতসুধাময়ী পুষ্পসুন্দরীসকল কোথায় গেল? যেখানে সব যাইবে, সেইখানে-স্মৃতির দর্পণতলে, ভূতসাগরগর্ভে। যেখানে রাজা প্রজা, পর্ব্বত সমুদ্র, গ্রহ নক্ষত্রাদি গিয়াছে বা যাইবে, সেইখানে-ধ্বংসপুরে! এই বিবাহের ন্যায় সব শূন্যে মিশাইবে, সব বাতাসে গলিয়া যাইবে-কেবল থাকিবে-কি? ভোগ? না, ভোগ্য না থাকিলে ভোগ থাকিতে পারে না। তবে কি? স্মৃতি? কুসুম বলিল, "ওঠ না-কি কচ্ছো?" আমি বলিলাম, "দূর পাগলি, আমি বিয়ে দিচ্ছিলাম।" কুসুম ঘেঁষে এসে, হেসে হেসে কাছে দাঁড়াইয়া আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার বিয়ে, কাকা?" আমি বলিলাম, "ফুলের বিয়ে।" "ওঃ পোড়া কপাল, ফুলের? আমি বলি কি! আমিও যে এই ফুলের বিয়ে দিয়েছি।" "কই?" "এই যে মালা গাঁথিয়াছি।" দেখিলাম, সেই মালায় আমার বর কন্যা রহিয়াছে।

১০. বড় বাজার

দশম সংখ্যা-বড় বাজার

প্রসন্ন গোয়ালিনীর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিতেছি। আমি নসীরাম বাবুর গৃহে আসিয়া অবধি তাহার নিকট ক্ষীর, সর, দধি দুগ্ধ এবং নবনীত খাইতেছি। আহারকালে মনে করিতাম, প্রসন্ন কেবল পরলোকে সদ্গতির কামনায় অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে-; জানিতাম, সংসারারণ্যে যাহারা পুণ্যরূপ মৃগ ধরিবার জন্য ফাঁদ পাতিয়া বেড়ায়, প্রসন্ন তন্মধ্যে সুচতুরা; ভোজনান্তে নিত্যই প্রসন্নের পরকালে অক্ষয় স্বর্গ; এবং ইহকালে মৌতাত বৃদ্ধির জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতাম। কিন্তু এক্ষণে হায়! মানব-চরিত্র কি ভীষণ স্বার্থপরতায় কলঙ্কিত! এক্ষণে সে মূল্য চাহিতেছে!

সুতরাং তাহার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদের সম্ভাবনা। প্রথম দিন সে যখন মূল্য চাহিল, রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিলাম-দ্বিতীয় দিনে বিস্মিত হইলাম-তৃতীয় দিনে গালি দিয়াছি। এক্ষণে সে দুধ দই বন্ধ করিয়াছে। কি ভয়ানক! এত দিনে জানিলাম, মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর; এত দিনে জানিয়াছি যে, যে সকল আশা ভরসা সযত্নে হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া বিশ্বাস-জলে পুষ্ট কর, সকলই বৃথা। এক্ষণে জানিয়াছি যে, ভক্তি প্রীতি স্নেহ প্রণয়াদি সকলই বৃথা গল্প-আকাশকুসুম! ছায়াবাজি! হায়! মনুষ্যজাতির কি হইবে! হায়, অর্থলুব্ধ গোয়ালা জাতিকে কে নিস্তার করিবে! হায়! প্রসন্ন নামে গোয়ালিনীর কবে গোরু চুরি যাবে!

প্রসন্নের দুগ্ধ দধি আছে, সে দিবে, আমার উদর আছে, খাইব, তাহার সঙ্গে এই সম্বন্ধ ইহাতে সে মূল্য চাহে কোন্ অধিকারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। প্রসন্ন বলে, আমি অধিকার অনধিকার বুঝি না; আমার গোরু, আমার দুধ, আমি মূল্য লইব। সে বুঝে না যে, গোরু কাহারও নহে; গোরু গোরুর নিজের; দুধ, যে খায় তারই।

তবে এ সংসারে মূল্য লওয়া একটা রীতি আছে, স্বীকার করি। কেবল খাদ্য সামগ্রী কেন, সকল সামগ্রীই মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়। দুধ দই, চাল দাল, খাদ্য পেয়, পরিধেয় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্য দূরে থাকুক, বিদ্যা বুদ্ধিও মূল্য দিয়া কিনিতে হয়। কালেজে মূল্য দিয়া বিদ্যা কিনিতে হয়। অনেকে ভাল কথা মূল্য দিয়া কিনিয়া থাকেন। হিন্দুরা সচরাচর মূল্য দিয়া ধর্ম্ম কিনিয়া থাকেন। যশঃ মান অতি অল্প মূল্যেই ক্রীত হইয়া থাকে। ভাল সামগ্রী মূল্য দিয়া কিনিতে হইবে, ইহাও কতক বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্য এমনই মূল্যপ্রিয় যে, বিনামূল্যে মন্দ সামগ্রীও কেহ কাহাকে দেয় না। যে বিষ খাইয়া মরিবার বাসনা কর, তাহাও তোমাকে বাজার হইতে মূল্য দিয়া কিনিয়া খাইতে হইবে।

অতএব এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার-সকলেই সেখানে আপনাপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি। সকলেই অনবরত ডাকিতেছে, “আমার দোকানে ভাল জিনিষ-খরিদ্দার চলে আয়”-সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, খরিদ্দারের চোখে ধূলা দিয়া রদি মাল পাচার করিবে। দোকানদার খরিদ্দারে কেবল যুদ্ধ, কে কাকে ফাঁকি দিতে পারে। সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনের দুঃখে আফিমের মাত্রা চড়াইলাম। তখন জ্ঞাননেত্র ফুটিল। সম্মুখে ভবের বাজার সুবিস্তৃত দেখিলাম। দেখিলাম, অসংখ্য দোকানদার, দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে-অসংখ্য খরিদ্দারে খরিদ করিতেছে-দেখিলাম, সেই অসংখ্য দোকানদারে অসংখ্য খরিদ্দারে পরস্পরকে অসংখ্য

অঙ্গুষ্ঠ দেখাইতেছে। আমি গামছা কাঁধে করিয়া, বাজার করিতে বাহির হইলাম। প্রথমেই রূপের দোকানে গেলাম। যে জিনিস ঘরে নাই, সেই দোকানে আগে যাইতে হয়-দেখিলাম যে, সংসারে সেই মেছো হাটা। পৃথিবীর রূপসীগণ মাছ হইয়া ঝুড়ি চুপড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়াছেন। দেখিলাম, ছোট বড় রুই, কাতলা, মৃগেল, ইলিস, চুনো পুঁটি, কই, মাগুর খরিদ্দারের জন্য লেজ আছড়াইয়া ধড়ফড় করিতেছে; যত বেলা বাড়িতেছে, তত বিক্রয়ের জন্য খাবি খাইতেছে।-মেছুনীরা ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো! কুল পুকুরের সস্তা মাছ, অমনি ছাড়বো-বোঝা বিক্রি হলেই বাঁচি।" কেহ ডাকিতেছে, "মাছ নেবে গো!-ধন সাগরের মিঠা মাছ-যে কেনে, তার পুনর্জন্ম হয় না-ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিবির মুণ্ডে পরিণত হইয়া তার ঘর দ্বারে ছড়াছড়ি যায়, যার সাধ্য থাকে কিনিবে। সোণার হাঁড়িতে চোখের জলে সিদ্ধ করিয়া হৃদয়-আগুনে কড়া জ্বাল দিয়া রাঁধিতে হয়-কে খরিদ্দার সাহস করিস্-আয়। সাবধান! হীরার কাঁটা-নাতি ঝাঁটা-গলায় বাঁধলে শাশুড়ীরূপী বিড়ালের পায়ে পড়িতে হয়-কাঁটার জ্বালায়, খরিদ্দার হলে কি পলায়! কেহ ডাকিতেছে, "ওরে আমার সরম পুঁটি, বিক্রি হলেই উঠি। ঝোলে ঝালে অম্বলে, তেলে ঘিয়ে জলে, যাতে দিবে ফেলে, রান্না যাবে চলে,-সংসারের দিন সুখে কাটাবে, আমার এই সরম পুঁটির বলে।" কেহ বলিতেছে, "কাদা ছেঁচে চাঁদা এনেছি-দেখে খরিদ্দার পাগল হয়! কিনে নিয়ে ঘর আলো কর।"

এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া মাছ কিনিতে প্রবৃত্ত হইলাম-কেন না, আমার নিরামিষ ঘরকরনা। দেখিলাম, মাছের দালাল আছে; নাম পুরোহিত। দালাল খাড়া হইলে পর জিজ্ঞাসা করিলাম-শুনিলাম, দর "জীবন সর্ব্বস্ব।" যে মাছ ইচ্ছা, সেই মাছ কেন, একই দর "জীবন সর্ব্বস্ব।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাল, এ মাছ কত দিন খাইব?" দালাল বলিল, "দু দিন চারি দিন, তার পর পচিয়া গন্ধ হইবে" তখন "এত চড়া দরে, এমন নশ্বর সামগ্রী কেন কিনিব?" ভাবিয়া আমি মেছো হাটা হইতে পলায়ন করিলাম। দেখিয়া মেছুনীরা গামছা কাঁধে মিনসেকে গালি পাড়িতে লাগিল।

রূপের বাজার ছাড়িয়া বিদ্যার বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এখানে ফলমূল বিক্রয় হয়। এক স্থানে দেখিলাম, কতকগুলি ফোঁটা-কাটা টিকিওয়ালা ব্রাহ্মণ তসর গরদ পরিয়া নামাবলি গায়ে, ঝুনা নারিকেলের দোকান খুলিয়া বসিয়া খরিদ্দার ডাকিতেছেন-"বেচি আমরা ঘটত্ব পটত্ব ষত্ব ণত্ব-ঘরে চাল থাকিলেই স্ব-ত্ব, নইলে ন-ত্ব। দ্রব্যত্ব জাতির গুণত্ব পদার্থ-বাপের শ্রাদ্ধে বিদায় না দিলেই তুই বেটা অপদার্থ। পদার্থতত্ব নামে ঝুনা নারিকেল-খাইতে বড় কঠিন-তাহার প্রথম ছোবড়ায় লেখ যে, ব্রাহ্মণীই পরম পদার্থ। অভাব নামে নারিকেল চতুর্ব্বিধ। 13- তোমার ঘরে ধন আছে, আমার ঘরে নাই ইহা অন্যোন্যাভাব। যতক্ষণ না পাই, ততক্ষণ প্রাগভাগ; খরচ হইয়া গেলেই ধ্বংসাভাব; আর আমাদের ঘরে সর্ব্বদাই অত্যন্ত অভাব। অভাব নিত্য, কি অনিত্য যদি সংশয় থাকে, তবে আমাদের ভাণ্ডারে উঁকি মার-দেখিবে, নিত্যই অভাব। অতএব আমাদের ঝুনা নারিকেল কেন। ব্যাপ্য, ব্যাপক ব্যাপ্ত, এ নারিকেলের শাঁস, ব্রাহ্মণের হস্ত হইল ব্যাপ্য রজত হইল ব্যাপক; আর তুমি দিলেই ঘটিল ব্যাপ্তি; এই ঝুনা নারিকেল কেন, এখনই বুঝিবে। দেখ বাপু, কার্য্য কারণ সম্বন্ধ বড় গুরুতর কথা; টাকা দাও, এখনই একটা কার্য্য হইবে, কম দিলেই অকার্য্য। আর কারণ বুঝাইব কি, এই যে দুই প্রহর রৌদ্রে ঝুনা নারিকেল বেচিতে আসিয়াছি ব্রাহ্মণীই তাহার কারণ-কিছু যদি না কেন, তবে নারিকেল বহা,-অকারণ। অতএব নারিকেল কেন, নহিলে এই ঝুনা নারিকেল মাথায় ঠুকিয়া মরিব।" ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রখর তপনতপ্ত ঘর্ম্মাক্ত ললাট এবং বাগবিতণ্ডাজনিত অধরসুধাবৃষ্টি দেখিয়া দয়া

হইল–জিজ্ঞাসা করিলাম, “হ্যাঁ ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ঝুনা নারিকেল কিনিতে আপত্তি নাই, কিন্তু দোকানে দা আছে? ছুলিবে কি প্রকারে?”
“না বাপু, দা রাখি না।”
“তবে নারিকেল ছোল কিসে?”
“আমরা ছুলি না–আমরা কামড়াইয়া ছোবড়া খাই।”
শুনিয়া, আমি ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া পাশের দোকানে গেলাম।
দেখিলাম, ইহাদিগের সম্মুখেই এক্সপেরিমেন্টেল সায়েন্সের দোকান। কতকগুলি সাহেব দোকানদার, ঝুনা নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, সুপারি প্রভৃতি ফল বিক্রয় করিতেছেন। ঘরের উপরে বড় বড় পিতলের অক্ষরে লেখা আছে।

MESSRS BROWN JONES AND
ROBINSON
NUT SUPPLIERS
ESTABLISHED 1757
ON THE FIELD OF PLASSEY.
MESSRS BROWN JONES AND ROBINSON
Offer to the Indian Public
A Large Assorment of
NUTS.
PHYSICAL, METAPHYSICAL,
LOGICAL, ILLOGICAL,
AND
SUFFICIENT TO BREAK THE JAWS
AND
DISLOCATE THE TEETH OF
ALL INDIAN YOUTHS
WHO STAND IN NEED OF HAVING THEIR
DENTAL SUPERFLUITIES CURTAILED.

দোকানদার ডাকিতেছেন–“আয় কালা বালক, Experimental Science খাবি আয়। দেখ, ১ নম্বর এক্সপেরিমেন্ট–ঘুষি; ইহাতে দাঁত উপড়ে, মাথা ফাটে এবং হাড় ভাঙ্গে। আমরা এ সকল এক্সপেরিমেন্ট বিনামূল্যে দেখাইয়া থাকি–পরের মাথা বা নরম হাড় পাইলেই হইল। আমরা স্থূল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ সাধনে পটু–রাসায়নিক বলে বা বৈদ্যুতীয় বলে বা চৌম্বক বলে, জড়পদার্থের বিশ্লেষণেই সুদক্ষ–কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মুষ্ট্যাঘাতের বলে মস্তকাদির বিশ্লেষণেই আমরা কৃতকার্য্য। মাধ্যাকর্ষণ, যৌগিকাকর্ষণ, চৌম্বকাকর্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ এই আকর্ষণের কথা আমরা অবগত আছি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশাকর্ষণেই আমরা কৃত বিদ্য। সংসারে জড়পদার্থের নানাবিধ যোগ দেখা যায়; যথা–

বায়ূতে অম্লজান ও যবক্ষারজানের সামান্য যোগ, জলে জলযান ও অম্লজানের রাসায়নিক যোগ, আর তোমাদিগের পৃষ্ঠে, আমাদের হস্তে, মুষ্টিযোগ। অতএব এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিবে যদি, মাথা বাড়াইয়া দাও; এক্সপেরিমেন্ট করিব। দেখিবে, গ্রাবিটেশ্যনের বলে এই সকল নারিকেলাদি তোমাদের মস্তকে পড়িবে; পর্কশন্ নামক অদ্ভুত শাব্দিক রহস্যেরও পরিচয় পাইবে, এবং দেখিবে, তোমার মস্তিষ্কস্থিত স্নায়ব পদার্থের গুণে তুমি বেদনা অনুভূত করিবে। অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে।" আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল?" সাহেবরা বলিলেন, "ইহাকে বলে, "Asiatic Researches." আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।
অগ্রিম মূল্য দিও; তাহা হইলে চ্যারিটিতে এক্সপেরিমেন্ট খাইতে পারিবে।"
আমি এই সকল দেখিতে শুনিতেছিলাম, এমত সময়ে সহসা দেখিলাম যে, ইংরেজ দোকানদারেরা, লাঠি হাতে, দ্রুতবেগে ব্রাহ্মণদিগের ঝুনা নারিকেলের গাদার উপর গিয়া পড়িলেন, দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা নারিকেল ছাড়িয়া দিয়া, নামাবলি ফেলিয়া, মুক্তকচ্ছ হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন সাহেবরা সেই সকল পরিত্যক্ত নারিকেল দোকানে উঠাইয়া লইয়া আসিয়া বিলাতী অস্ত্রে ছেদন করিয়া, সুখে আহার করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "এ কি হইল?" সাহেবরা বলিলেন, "ইহাকে বলে, "Asiatic Researches." আমি তখন ভীত হইয়া, আত্মশরীরে কোন প্রকার Anatomical Researches আশঙ্কা করিয়া, সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।
সাহিত্যের বাজার দেখিলাম। দেখিলাম, বাল্মীকি প্রভৃতি ঋষিগণ অমৃত ফল বেচিতেছেন; বুঝিলাম, ইহা সংস্কৃত সাহিত্য। দেখিলাম, আর কতকগুলি মনুষ্য নিচু পীচ পেয়ারা আনারস আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ফল বিক্রয় করিতেছেন–বুঝিলাম, এ পাশ্চাত্য সাহিত্য। আরও একখানি দোকান দেখিলাম–অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে–ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না–জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ কিসের দোকান?"
বালকেরা বলিল, "বাঙ্গালা সাহিত্য।"
"বেচিতেছে কে?"
"আমরাই বেচি। দুই এক জন বড় মহাজনও আছে। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।"
"কিনতেছে কে?"
"আমরাই।"
বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম–খবরের কাগজ জড়ান কতকগুলি অপক্ক কদলী।
তাহার পরে কলু পটিতে গেলাম; দেখিলাম যত উমেদার, মোসায়েব সকলে কলু সাজিয়া তেলের ভাঁড় লইয়া সারি সারি বসিয়া গিয়াছে। তোমার ট্যাঁকে চাকরি আছে, শুনিতে পাইলেই পা টানিয়া লইয়া, ভাঁড় বাহির করিয়া, তেল মাখাইতে বসে। চাকরি না থাকিলেই–যদি থাকে, এই ভরসায়, পা টানিয়া

লইয়া, তেল লেপিতে বসে। তোমার কাছে চাকরি নাই-নাই নাই-নগদ টাকা আছে ত-আচ্ছা, তাই দাও-তেল দিতেছি। কাহারও প্রার্থনা, তোমার বাগানে বসিয়া তুমি যখন ব্রাণ্ডি খাইবে, আমি তোমার চরণে তৈল মাখাইব-আমার কন্যার বিবাহটি যেন হয়। কাহারও আবদার, কাণে অবিরত খোশামোদের গন্ধ তৈল ঢালিব-বাড়ীর প্রাচীরটি যেন দিতে পারি। কাহারও কামনা, তোমার তোষাখানার বাতি জ্বালিয়া দিব-আমার খবরের কাগজখানি যেন চলে। শুনিয়াছি, কলুদিগের টানাটানিতে অনেকের পা খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। আমার শঙ্কা হইল, পাছে কোন কলু আফিঙ্গের প্রার্থনায় আমার পায়ে তেল দিতে আরম্ভ করে। আমি পলায়ন করিলাম।

তার পরে যশের ময়রাপটী। সম্বাদপত্রলেখক নামে ময়রাগণ, গুড়ে সন্দেশের দোকান পাতিয়া, নগদ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে-রাস্তার লোক ধরিয়া সন্দেশ গতাইয়া দিয়া, হাত পাতিতেছে-মূল্য না পাইলেই কাপড় কাড়িয়া লইতেছে। এদিকে তাঁহাদের বিক্রেয় যশের দুর্গন্ধে পথিক নাসিকা আবৃত করিয়া পলায়ন করিতেছে। দোকানদারগণ বিনা ছানায়, শুধু গুড়ে, আশ্চর্য্য সন্দেশ করিয়া, সস্তা দরে বিক্রয় করিতেছেন। কেহ টাকাটা সিকেটায়, আনা দু আনায়, কেহ কেবল খাতিরে-কেহ বা এক সাঁজ ফলাহার পেলেই ছাড়েন-কেহ বা বাবুর গাড়িতে চড়িতে পেলেই যশোবিক্রয় করেন। অন্যত্র রাজপুরুষগণ মিঠাইওয়ালা সাজিয়া রায়বাহাদুর, রাজবাহাদুর খেতাব, খেলাত, নিমন্ত্রণ, ধন্যবাদ প্রভৃতি মিঠাই লইয়া দোকান পাতিয়া বসিয়া আছেন,-চাঁদা, সেলাম, খোশামোদ, ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, মূল্য লইয়া মিঠাই বেচিতেছেন। বিক্রয়ের বড় বেবন্দোবস্ত-কেহ সর্ব্বস্ব দিয়া এক ঠোঙ্গা পাইতেছে না-কেহ শুধু সেলামে দেড় মণ লইয়া যাইতেছে। এইরূপ অনেক দোকান দেখিলাম-কিন্তু সর্ব্বত্রই পচা মাল আধা দরে বিক্রয় হইতেছে-খাঁটি দোকান দেখিলাম না। কেবল একখানি দোকান দেখিলাম-তাহা অতি চমৎকার।

দেখিলাম, দোকানের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার-কিছু দেখা যায় না। ডাকিয়া দোকানদারের উত্তর পাইলাম না-কেবল সর্ব্বপ্রাণিভীতিসাধক অনন্ত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম-অল্পালোকে দ্বারে ফলক-লিপি পড়িলাম।

যশের পণ্যশালা।
বিক্রেয়-অনন্ত যশ।
বিক্রেতা-কাল।
মূল্য-জীবন।
জীয়ন্তে কেহ এখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না।
আর কোথাও সুযশ বিক্রয় হয় না।

পড়িয়া ভাবিলাম-আমার যশে কাজ নাই-কমলাকান্তের প্রাণ বাঁচিলে অনেক যশ হইবে।

বিচারের বাজারে গেলাম-দেখিলাম সেটা কসাইখানা। টুপি মাথায়, শামলা মাথায়-ছোট বড় কসাইসকল, ছুরি হাতে গোরু কাটিতেছে। মহিষাদি বড় বড় পশুসকল শৃঙ্গ নাড়িয়া ছুটিয়া পলাইতেছে;-ছাগ মেষ এবং গোরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশুসকল ধরা পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া গোরু বলিয়া একজন কসাই বলিল, “এও গোরু কাটিতে হইবে।” আমি সেলাম করিয়া পলাইলাম।

আর বড় বাজার বেড়াইবার সাধ রহিল না-তবে প্রসন্নের উপর রাগ ছিল বলিয়া একবার দইয়েহাটা

দেখিতে লাগিলাম-গিয়া প্রথমেই দেখিলাম যে, সেখানে খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী নামে গোয়ালা-দপ্তররূপ পচা ঘোলের হাঁড়ি লইয়া বসিয়া আছে-আপনি ঘোল খাইতেছে, এবং পরকে খাওয়াইতেছে। তখন চমক হইল-চক্ষু চাহিলাম-দেখিলাম, নসী বাবুর বাড়ীতেই আছি। ঘোলের হাঁড়ি কাছে আছে বটে। প্রসন্ন এক হাঁড়ি ঘোল আনিয়া আমাকে সাধিতেছে-"চক্রবর্ত্তী মশাই-রাগ করিও না। আজ আর দুধ দই নাই-এই ঘোলটুকু আনিয়াছি-ইহার দাম দিতে হইবে না।"

----

13 -নৈয়াকেরা বলেন, অভাব চতুর্ব্বিধ; অন্যোন্যাভাব, প্রাগভাব, ধ্বংসভাব আর অত্যন্তাভাব। - শ্রীকমলাকান্ত।

১১. আমার দুর্গোৎসব

সপ্তমীপূজার দিন কে আমাকে এত আফিঙ্গ চড়াইতে বলিল! আমি কেন আফিঙ্গ খাইলাম! আমি কেন প্রতিমা দেখিতে গেলাম! যাহা কখন দেখিব না, তাহা কেন দেখিলাম! এ কুহক কে দেখাইল! দেখিলাম-অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে-আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম-অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত-মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে-আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা-একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল-নিতান্ত একা-মাতৃহীন-মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল-দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতরুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল-স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল-সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম-সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি-এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী-অনন্তরত্ন-ভূষিতা-এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ-দশ দিক্-দশ দিকে প্রসারিত তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দ্দিত বীরজন কেশরী শত্রু নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না-আজি দেখিব না, কাল দেখিব না-কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না-কিন্তু এক দিন দেখিব-দিগভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিনী শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী-দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্ত্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

কোথায় ফুল পাইলাম, বলিতে পারি না-কিন্তু সেই প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম-ডাকিলাম, "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে আমার সর্ব্বার্থসাধিকে! অসংখ্য সন্তানকুল-পালিকে! ধর্ম্ম অর্থ, সুখ দুঃখদায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর। এই ভক্তি প্রীতি বৃত্তি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, তুমি এই অনন্তজলমণ্ডল ত্যাগ করিয়া এই বিশ্ব-বিমোহিনী মূর্ত্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা! নবরাগরঙ্গিণি নববলধারিণি, নবদর্পে দর্পিণি, নবস্বপ্নদর্শিনি!-এসো মা, গৃহে এসো-ছয় কোটি সন্তানে একত্রে, এক কালে দ্বাদশ কোটি কর যোড় করিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব। ছয় কোটি মুখে ডাকিব, মা প্রসূতি অম্বিকে! ধাত্রি ধরিত্রি ধনধান্যদায়িকে! নগাঙ্কশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে! শরৎসুন্দরি চারুপূর্ণচন্দ্রভালিকে! ডাকিব,-সিন্ধুসেবিতে সিন্ধু-পূজিতে সিন্ধু-মথনকারিণি! শত্রুবধে দশভূজে দশপ্রহরণ-ধারিণি! অনন্তশ্রী অনন্তকালস্থায়িনি! শক্তি দাও সন্তানে, অনন্তশক্তি-প্রদায়িনি! তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব-এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিব,-এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব-না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এসো মা, গৃহে এসো-যাঁহার ছয় কোটি সন্তান-তাঁহার ভাবনা কি?

দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না-সেই অনন্ত কাল-সমুদ্রে এই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পূরিল! তখন যুক্ত করে, সজল নয়নে, ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ি বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব-তোমার মুখ

রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীত-এবার আপনা ভুলিব-ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব-অধর্ম্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব-উঠ মা-একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা! উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী!

মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?

এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশ কোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় বহিয়া, ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে-চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই কাল-সমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি-সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি? আইস, প্রতিমা তুলিয়া আনি, বড় পূজার ধুম বাধিবে। দ্বেষক ছাগকে হাড়িকাটে ফেলিয়া সংকীর্ত্তি খড়্গে মায়ের কাছে বলি দিব-কত পুরাবৃত্তাকার ঢাকী, ঢাক ঘাড়ে করিয়া, বঙ্গের বাজনা বাজাইয়া আকাশ ফাটাইবে-কত ঢোল, কাঁসি, কাড়া, নাগরায় বঙ্গের জয় বাদিত হইবে। কত সানাই পোঁ ধরিয়া গাইবে "কত নাচ গো!"- বড় পূজার ধুম বাধিবে। কত ব্রাহ্মণপণ্ডিত লুচি মণ্ডার লোভে বঙ্গপূজায় আসিয়া পাতড়া মারিবে-কত দেশী বিদেশী ভদ্রাভদ্র আসিয়া মায়ের চরণে প্রণামি দিবে-কত দীন দুঃখী প্রসাদ খাইয়া উদর পূরিবে। কত নর্ত্তকী নাচিবে, কত গায়কে মঙ্গল গায়িবে, কত কোটি ভক্তে ডাকিবে, মা! মা! মা!-

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি ।
জয় জয় জয় বঙ্গজগদ্ধাত্রি ।।
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে ।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে ।।
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি ।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি ।।
দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি ।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি ।।
জয় জয় লক্ষ্মি বারীন্দ্রবালিকে ।
জয় জয় কমলাকান্তপালিকে ।।
জয় জয় ভক্তিশক্তিদায়িকে।
পাপতাপভয়শোকনাশিকে ।।
মৃদুল গম্ভীর ধীর ভাষিকে ।
জয় মা কালি করালি অম্বিকে ।।
জয় হিমালয়নগবালিকে ।
অতুলিত পূর্ণচন্দ্রভালিকে ।।
শুভে শোভনে সর্ব্বার্থসাধিকে ।
জয় জয় শান্তি শক্তি কালিকে ।।
জয় মা কমলাকান্তপালিকে ।।
নমোহস্তু তে দেবি বরপ্রদে শুভে ।

নমোহস্তু তে কামচরে সদা ধ্রুবে ।।
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণি ভূতভব্যে যশস্বিনি।
ত্রাহিং মাং সর্ব্বদুঃখেভ্যো দানবানাং ভয়ঙ্করি ।।
নমোহস্তু তে জগন্নাথে জনার্দ্দনি নমোহস্তু তে ।
প্রিয়দান্তে জগন্মাতঃ শৈলপুত্রি বসুন্ধারে ।।
ত্রায়স্ব মাং বিশালাক্ষি ভক্তানামার্ত্তিনাশিনি ।
নমামি শিরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু বিমোচিতঃ ।।14

----

14 আর্য্যাস্তোত্র দেখ

১২. একটি গীত

"শোন্ প্রসন্ন, তোকে একটি গীত শুনাইব।"
প্রসন্ন গোয়ালিনী বলিল, "আমার এখন গান শুনিবার সময় নয়-দুধ যোগাবার বেলা হলো।"
কমলাকান্ত। "এসো এসো বঁধু এসো।"
প্রসন্ন। "ছি ছি ছি! আমি কি তোমার বঁধু?"
কমলাকান্ত। "বালাই! ষাট, তুমি কেন বঁধু হইতে যাইবে? আমার গীতে আছে"-
এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো-
সুর করিয়া আমি কীর্ত্তন ধরাতে প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে রাখিয়া বসিল, আমি গীতটি আদ্যোপান্ত গায়িলাম।

এসো এসো বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো-
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে, মনের মানসে,
তোমার ধনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।.
নারী না করিত বিধি, তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ।।
বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধনশালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

মিল ত চমৎকার, "দেখি" আর "বিধি" মিলিল! কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায়, এইরূপ মোহ মন্ত্র আর একটি শুনিব, মনে বড় সাধ রহিয়াছে। যখনই এই গান প্রথম কর্ণ ভরিয়া শুনিয়াছিলাম, মনে হইয়াছিল, নীলাকাশতলে ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া এই গীত গাই-মনে হইয়াছিল, সেই বিচিত্র সৃষ্টিকুশলী কবির সৃষ্টি দৈববংশী লইয়া, মেঘের উপর যে বায়ুস্তর-শব্দশূন্য, দৃশ্যশূন্য, পৃথিবী যেখান হইতে দেখা যায় না, সেইখানে বসিয়া, সেই মুরলীতে, একা এই গীত গাই-এই গীত কখন ভুলিতে পারিলাম না; কখন ভুলিতে পারিব না।
"এসো এসো বঁধু এসো"15
লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাস-প্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল-এক হৃদয় অন্য

হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল–সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়-কামনা। মনুষ্যহৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ–মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য–কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জন সমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া; হৃদয়ে হৃদয় আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব–"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্বকর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু-সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি–"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

লোকের মনে কি আছে বলিতে পারি না, কিন্তু আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, বুঝিতে পারি না যে, ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তিতে কিছু সুখ আছে। যে পশু ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি জন্য পরসন্দর্শনের আকাঙ্ক্ষী, সে যেন কখন কমলাকান্ত শর্ম্মার দপ্তর-মুক্তাবলী পড়িতে বসে না। আমি বিলাস-প্রিয়ের মুখে "এসো এসো বঁধু এসো" বুঝিতে পারি না। কিন্তু ইহা বুঝিতে পারি যে, মনুষ্য মনুষ্যের জন্য হইয়াছিল–এক হৃদয় অন্য হৃদয়ের জন্য হইয়াছিল–সেই হৃদয়ে হৃদয়ে সংঘাত হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন, ইহা মনুষ্য-জীবনের সুখ। ইহজন্মে মনুষ্যহৃদয়ে একমাত্র তৃষা, অন্যহৃদয়-কামনা। মনুষ্যহৃদয় অনবরত হৃদয়ান্তরে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তিসকল শরীর রক্ষার্থ–মহতী প্রবৃত্তিসকলের উদ্দেশ্য, "এসো এসো বঁধু এসো।" তুমি চাকরি কর, খাইবার জন্য–কিন্তু যশের আকাঙ্ক্ষা কর, পরের অনুরাগ লাভ করিবার জন্য, জন সমাজের হৃদয়কে তোমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত করিবার জন্য। তুমি যে পরোপকার কর, সে পরের হৃদয়ের ক্লেশ আপন হৃদয়ে অনুভূত কর বলিয়া। তুমি যে রাগ কর, সে তোমার মনোমত কার্য্য হইল না বলিয়া; হৃদয়ে হৃদয় আসিল না বলিয়া। সর্ব্বত্র এই রব–"এসো এসো বঁধু এসো।" সর্ব্বকর্ম্মের এই মন্ত্র, "এসো এসো বঁধু এসো।" জড় জগতের নিয়ম আকর্ষণ। বৃহৎ গ্রহ উপগ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" সৌরপিণ্ড বৃহৎ গ্রহকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগৎ জগদন্তরকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" পরমাণু পরমাণুকে অবিরত ডাকিতেছে "এসো এসো বঁধু এসো।" জড়পিণ্ডসকল, গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু-সকলেই এই মোহমন্ত্রে বাঁধা পড়িয়া ঘুরিতেছে। প্রকৃতি পুরুষকে ডাকিতেছে, "এসো এসো বঁধু এসো।" জগতের এই গম্ভীর অবিশ্রান্ত ধ্বনি–"এসো এসো বঁধু এসো।" কমলাকান্তের বঁধু কি আসিবে?

"আধ আঁচরে বসো।"

এই তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন, কণ্টকাদিতে কর্কশ সংসারারণ্যে, হে বাঞ্ছিত! তোমাকে আর কি আসন দিব, আমার এই হৃদয়াবরণের অর্দ্ধেকে উপবেশন কর। কুশকণ্টকাদি হইতে তোমার আচ্ছাদন জন্য আমি এই আপন অঙ্গ অনাবৃত করিতেছি–আমার আঁচরে বসো। যাহাতে আমার লজ্জারক্ষা, মানরক্ষা, যাহাতে আমার শোভা, হে মিলিত! তুমিও তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ কর–আধ আঁচরে বসো। হে পরের হৃদয়, হে

সুন্দর, হে মনোরঞ্জন, হে সুখদ! কাছে এসো, আমাকে স্পর্শ কর, আমি তোমাতে সংলগ্ন হইব-দূরে আসনগ্রহণ করিও না-এই আমার শরীরলগ্ন অঞ্চলার্দ্ধে বসো। হে কমলাকান্ত! হে দুর্বিনীত! হে আজন্মবিবাহশূন্য! তুমি এতদর্থে শান্তিপুরে কল্কাদার আঁচলের আধখানা বুঝিও না। তুমি যে অঞ্চলার্দ্ধে বসিবে, তাহার তাঁতি আজও জন্মে নাই। মনের নগ্নত্ব জ্ঞান-বস্ত্রে আবৃত; অর্দ্ধেকে তোমার হৃদয় আবৃত রাখ, অর্দ্ধেকে বাঞ্ছিতকে বসাও। তুমি মূর্খ-তথাপি তোমার অপেক্ষা মূর্খ যদি কেহ থাকে, তাহাকে ডাক-

"এসো এসো বঁধু এসো-আধ আঁচরে বসো।"

"নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।"

কেহ কখন দেখিয়াছে? তুমি অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছ-কখন নয়ন ভরিয়া আত্মধন দেখিতে পাইয়াছ? তুমি যশস্বী হইবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছ-কিন্তু আত্মযশোরাশি দেখিয়া কবে তোমার নয়ন ভরিয়াছে? রূপতৃষ্ণায় তুমি ইহজীবন অতিবাহিত করিলে-যেখানে ফুলটি ফুটে, ফুলটি দোলে, যেখানে পাখীটি উড়ে, যেখানে মেঘ ছুটে, গিরিশৃঙ্গ উঠে, নদী বহে, জল ঝরে, তুমি সেইখানে রূপের অনুসন্ধানে ফিরিয়াছ-যেখানে বালক, প্রফুল্ল মুখমণ্ডল আন্দোলিত করিয়া হাসে, যেখানে যুবতী ব্রীড়াভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হইয়া শঙ্কিতগমনে যায়, যেখানে প্রৌঢ়া নিতান্তস্ফুটিতা মধ্যাহ্নপদ্মিনীবৎ অকাতরে রূপের বিকাশ করে, তুমি সেইখানেই রূপের সন্ধানে ফিরিয়াছ, কখন নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়াছ? দেখ নাই কি যে, কুসুম দেখিতে দেখিতে শুকায়, ফল দেখিতে দেখিতে পাকে, পড়ে, পচে গলে; পাখী উড়িয়া যায়, মেঘ চলিয়া যায়, গিরি ধূমে লুকায়, নদী শুকায়, চাঁদ ডুবে, নক্ষত্র নিবিয়া যায়। শিশুর হাসি রোগে হরণ করে, যুবতীর ব্রীড়া-কিসে না যায়? প্রৌঢ়া বয়সে শুকাইয়া যায়। ইহা সংসারের দুরদৃষ্ট-কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। অথবা এই সংসারের শুভাদৃষ্ট-কেহ কিছু নয়ন ভরিয়া দেখিতে পায় না। গতিই সংসারের সুখ-চাঞ্চল্যই সংসারের সৌন্দর্য্য। নয়ন ভরে না। সে নয়ন আমরা পাই নাই। পাইলেই সংসার দুঃখময় হইত; পরিতৃপ্তি-রাক্ষসী আমাদের সকল সুখকে গ্রাস করিত। যে কারিগর এই পরিবর্ত্তনশীল সংসার, আর এই অতৃপ্য নয়ন সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার কারিগরির উপর কারিগরি, এই বাসনা, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, নয়নও অতৃপ্য, অথচ বাসনা-নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

হে রূপ! হে বাহ্য সৌন্দর্য্য! হে অন্তঃপ্রকৃতির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট! কাছে আইস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি। দূরে বসিলে দেখা হইবে না; কেন না, দেখা কেবল নয়নে নহে। সংস্পর্শে বা নৈকট্য ব্যতীত মনের বৈদ্যুতী বহে না-আমরা সর্ব্ব শরীরে দেখিয়া থাকি। মন হইতে মনে বৈদ্যুতী চলিলে তবে নয়ন ভরিবে! হায়! কিসেই বা নয়ন ভরিবে! নয়নে যে পলক আছে!

"অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি হে!"

আমি কখন কখন মনে করিয়া থাকি, কেবল দুঃখের পরিমাণ জন্যই দয়া করিয়া বিধাতা দিবসের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নহিলে কাল অপরিমেয়, মনুষ্য-দুঃখ অপরিমিত হইত। আমরা এখন বলিতে পারি যে, আমি দুই দিন, দুই মাস বা দুই বৎসর দুঃখবোধ করিতেছি; কিন্তু দিন রাত্রির পরিবর্ত্তন না থাকিলে, কালের পথ চিহ্নশূন্য হইলে, কে না বুঝিত যে, আমি অনন্ত কাল দুঃখবোধ করিতেছি? আশা তাহা হইলে দাঁড়াইবার স্থান পাইত না-এতদিন পরে আবার দুঃখান্ত হইবে, এ কথা কেহ ভাবিতে

পারিত না–বৃক্ষাদিশূন্য অনন্ত প্রান্তবরৎ জীবনের পথ অনুত্তীর্ণ হইত–জীবনযাত্রা দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাস্বরূপ হইত। অতএব এই বৃহৎ জগৎকেন্দ্র সূর্য্যের পথ আমাদের সুখ দুঃখের মানদণ্ড। দিবস–গণনায় সুখ আছে। সুখ আছে বলিয়াই দুঃখী জন দিবস গণিয়া থাকে। দিবস–গণনা দুঃখবিনোদন। কিন্তু এমন দুঃখীও আছে যে, সে দিবস গণে না; দিবস–গণনা তাহার পক্ষে চিত্তবিনোদন নহে। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী–পৃথিবীতে ভুলিয়া মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়াছি–সুখহীন, আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, আকাঙ্ক্ষাশূন্য আমি কি জন্য দিবস গণিব? এই সংসার–সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ; সংসার–বাত্যায় আমি ঘূর্ণ্যমান ধূলিকণা, সংসারারণ্যে আমি নিষ্ফল বৃক্ষ–সংসারাকাশে আমি বারিশূন্য মেঘ–আমি কেন দিবস গণিব? গণিব। আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দী ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?
"মণি নও মাণিক নও যে, হার ক'রে গলে পরি___"
বিধাতা জগৎ জড়ময় করিয়াছেন কেন? রূপ জড়পদার্থ কেন? সকলই অশরীরী হইল না কেন? হইলে হৃদয়ে হৃদয়ে কেমন মিলিত! যদি রূপের শরীরে প্রয়োজন ছিল, তবে তোমার আমার বিধাতা এক শরীর করেন নাই কেন? তাহা হইলে আর ত বিচ্ছেদ হইত না। এখন কি এক শরীর হয় না? আমার শরীরে এত স্থান আছে–তোমাকে তাহাতে কোথাও কি রাখিতে পারি না? তোমাকে কন্ঠলগ্ন করিয়া হৃদয়ে বিলম্বিত করিয়া রাখিতে পারি না? হায়! তুমি মণি নও, মাণিক নও যে, হার করিয়া গলে পরি।
আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি–মাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া, কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে, দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!

"আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণবিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।"

প্রথমে আহ্বান, "এসো এসো বঁধু এসো," পরে আদর, "আঁধ আঁচরে বসো," পরে ভোগ "নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" তখন সুখভোগকালীন পূর্ব্বদুঃখস্মৃতি–"অনেক দিবসে, মনের মানসে, তোমা ধনে মিলাইল বিধি।" সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,

"মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলে পরি।"

পরে সম্পূর্ণ সুখ,

“আমায় নারী না করিত বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ!”

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য্য। এ সুখ কোথায় রাখিব, লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব? এ সুখের ভার লইয়া আমি দেশে দেশে ফিরিব; এ সুখ এক স্থানে ধরে না; যেখানে যেখানে পৃথিবীতে স্থান আছে, সেইখানে সেইখানে এ সুখ লইয়া যাইব, এ জগৎ সংসার এই সুখে পুরাইব। সংসার এ সুখের সাগরে ভাসাইব; মেরু হইতে মেরু পর্য্যন্ত সুখের তরঙ্গ নাচাইব, আপনি ডুবিয়া, উঠিয়া, ভাসিয়া, হেলিয়া, ছুটিয়া বেড়াইব। এ সুখে কমলাকান্তের অধিকার নাই–এ সুখে বাঙ্গালির অধিকার নাই। সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন–আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন–তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।
সুখের কথায় বাঙ্গালির অধিকার নাই–কিন্তু দুঃখের কথায় আছে। কাতরোক্তি যত গভীর যতই হৃদয়বিদারক হউক না কেন, তাহা বাঙ্গালির মর্ম্মোক্তি।–আর কাতরোক্তি, কোথায় বা নাই? নবপ্রসূত পক্ষিশাবক হইতে মহাদেবের শৃঙ্গধ্বনি পর্য্যন্ত সকলই কাতরোক্তি। সম্পূর্ণ–সুখে সুখীও সুখকালে পূর্ব্বদুঃখ স্মরণ করিয়া কাতরোক্তি করে। নহিলে সুখের সম্পূর্ণতা কি? দুঃখস্মৃতি ব্যতীত সুখের সম্পূর্ণতা কোথায়? সুখও দুঃখময়–

“তোমায় যখন পড়ে মনে,
আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাই বাঁধি।”

এই কথা সুখ দুঃখের সীমারেখা! যাহার নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী–তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাহার বন্ধু, তাহার প্রিয়, বাঞ্ছিত–গিয়াছে, কিন্তু তাহার বৃন্দাবন আছে–মনে করিলে, সে সেই সুখভূমি পানে চাহিতে পারে। যাহার সুখ গিয়াছে–সুখের নিদর্শন গিয়াছে–বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে, এখন আর চাহিবার স্থান নাই–সেই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। বিধবা যুবতী, মৃত পতির যত্নরক্ষিত পাদুকা হারাইলে, যেমন দুঃখে দুঃখী হয়, তেমনিই দুঃখে দুঃখী।
আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে–নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষণসেন, জয়দেব শ্রীহর্ষ,-প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবনলাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ! আর্য্য রাজধানীর চিহ্ন কই? আর্য্যের ইতিহাস কই? জীবনচরিত কই? কীর্ত্তি কই? কীর্ত্তিস্তম্ভ কই? সমরক্ষেত্র কই? সুখ গিয়াছে–সুখ–চিহ্নও গিয়াছে, বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে–চাহিব কোন্ দিকে?
চাহিবার এক শ্মশান–ভূমি আছে–নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল।
বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান–ভূমি প্রতি চাই। যখন দেখি, সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম বেড়িয়া অদ্যাপি সেই কলধৌতবাহিনী গঙ্গা তর–তর রব করিতেছেন, তখন গঙ্গাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করি–তুমি আছ, সে রাজলক্ষ্মী কোথায়? তুমি যাঁহার পা ধুয়াইতে, সেই মাতা কোথায়? তুমি যাঁহাকে বেড়িয়া

বেড়িয়া নাচিতে, সেই আনন্দরূপিণী কোথায়? তুমি যাঁহার জন্য সিংহল, বালী, আরব, সুমিত্রা হইতে বুকে করিয়া ধন বহন করিয়া আনিতে, সে ধনেশ্বরী কোথায়? তুমি যাঁহার রূপের ছায়া ধরিয়া রূপসী সাজিতে, সে অনন্তসৌন্দর্য্যশালিনী কোথায়? তুমি যাঁহার প্রসাদি ফুল লইয়া ঐ স্বচ্ছ হৃদয়ে মালা পরিতে, সে পুষ্পাভরণা কোথায়? সে রূপ, সে ঐশ্বর্য্য কোথায় ধুইয়া লইয়া গিয়াছ? বিশ্বাসঘাতিনি, তুমি কেন আবার শ্রবণমধুর কল-কল তর-তর রবে মন ভুলাইতেছ? বুঝি তোমারই অতল গর্ভমধ্যে, যবনভয়ে ভীতা সেই লক্ষ্মী ডুবিয়াছেন, বুঝি কুপুত্রগণের আর মুখ দেখিবেন না বলিয়া ডুবিয়া আছেন। মনে মনে আমি সেই দিন কল্পনা করিয়া কাঁদি। মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জ্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কালপূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন। সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল; রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। পথিক ভীত হইয়া পথ ছাড়িল; নাগরীর অলঙ্কার খসিয়া পড়িল; কুঞ্জবনে পক্ষিগণ নীরব হইল; গৃহময়ূরকণ্ঠে অর্দ্ধব্যক্ত কেকার অপরার্দ্ধ আর ফুটিল না। দিবসে নিশীথ উপস্থিত হইল, পণ্যবীথিকার দীপমালা নিবিয়া গেল, পূজাগৃহে বাজাইবার সময়ে শঙ্খ বাজিল না; পণ্ডিতে অশুদ্ধ মন্ত্র পড়িল; সিংহাসন হইতে শালগ্রামশিলা গড়াইয়া পড়িল। যুবার সহসা বলক্ষয় হইল, যুবতী সহসা বৈধব্য আশঙ্কা করিয়া কাঁদিল; শিশু বিনারোগে মাতার ক্রোড়ে শুইয়া মরিল। গাঢ়তর, গাঢ়তর, গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা, সেই অন্ধকারে ঢাকিল-কুঞ্জতীরভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ, সেই অন্ধকারে-আঁধার, আঁধার, আঁধার হইয়া লুকাইল। আমি চক্ষে সব দেখিতেছি-আকাশ মেঘে ঢাকিতেছে-ঐ সোপানাবলী অবতরণ করিয়া রাজলক্ষ্মী জলে নামিতেছেন। অন্ধকারে নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকবিন্দুবৎ , জলে ক্রমে ক্রমে সেই তেজোরাশি বিলীন হইতেছে। যদি গঙ্গার অতল-জলে না ডুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষ্মী কোথায় গেলেন?

----

15 পাঠককে গীতের সঙ্গে মিলাইয়া গাইতে হইবে।

১৩. বিড়াল

আমি শয়নগৃহে, চারপায়ীর উপর বসিয়া, হুঁকা হাতে ঝিমাইতেছিলাম। একটু মিট্ মিট্ করিয়া ক্ষুদ্র আলো জ্বলিতেছে–দেয়ালের উপর চঞ্চল ছায়া, প্রেতবৎ নাচিতেছে। আহার প্রস্তুত হয় নাই–এজন্য হুঁকা হাতে, নিমীলিতলোচনে আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি যদি নেপোলিয়ন্ হইতাম, তবে ওয়াটার্লু জিতিতে পারিতাম কি না। এমত সময়ে একটি ক্ষুদ্র শব্দ হইল, "মেও!"

চাহিয়া দেখিলাম–হঠাৎ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। প্রথমে মনে হইল, ওয়েলিংটন হঠাৎ বিড়ালত্ব প্রাপ্ত হইয়া, আমার নিকট আফিঙ্গ ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। প্রথম উদ্যমে, পাষাণবৎ কঠিন হইয়া, বলিব মনে করিলাম যে, ডিউক মহাশয়কে ইতিপূর্ব্বে যথোচিত পুরস্কার দেওয়া গিয়াছে, এক্ষণে আর অতিরিক্ত পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ অপরিমিত লোভ ভাল নহে। ডিউক বলিল, "মেও!"

তখন চক্ষু চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিলাম যে, ওয়েলিংটন নহে। একটি ক্ষুদ্র মার্জ্জার; প্রসন্ন আমার জন্য যে দুগ্ধ রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা নিঃশেষ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে, আমি তখন ওয়াটার্লুর মাঠে ব্যূহ–রচনায় ব্যস্ত, অত দেখি নাই। এক্ষণে মার্জ্জারসুন্দরী, নির্জ্জল দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত হইয়া আপন মনের সুখ এ জগতে প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে, অতি মধুর স্বরে বলিতেছেন, "মেও!" বলিতে পারি না, বুঝি, তাহার ভিতর একটু ব্যঙ্গ ছিল; বুঝি, মার্জ্জার মনে মনে হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, "কেহ মরে বিল ছেঁচে, কেহ খায় কই।" বুঝি সে "মেও!" শব্দে একটু মন বুঝিবার অভিপ্রায় ছিল। বুঝি বিড়ালের মনের ভাব, "তোমার দুধ ত খাইয়া বসিয়া আছি–এখন বল কি?" বলি কি? আমি ত ঠিক করিতে পারিলাম না। দুধ আমার বাপেরও নয়। দুধ মঙ্গলার, দুহিয়াছে প্রসন্ন। অতএব সে দুগ্ধে আমারও যে অধিকার, বিড়ালেরও তাই; সুতরাং রাগ করিতে পারি না। তবে চিরাগত একটি প্রথা আছে যে, বিড়ালে দুধ খাইয়া গেলে, তাহাকে তাড়াইয়া মারিতে যাইতে হয়। আমি যে সেই চিরাগত প্রথার অবমাননা করিয়া মনুষ্যকুলে কুলাঙ্গার স্বরূপ পরিচিত হইব, ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। কি জানি, এই মার্জ্জারী যদি স্বজাতি–মণ্ডলে কমলাকান্তকে কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করে? অতএব পুরুষের ন্যায় আচরণ করাই বিধেয়। ইহা স্থির করিয়া, সকাতরচিত্তে, হস্ত হইতে হুঁকা নামাইয়া, অনেক অনুসন্ধানে এক ভগ্ন যষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া সগর্ব্বে মার্জ্জারী প্রতি ধাবমান হইলাম।

মার্জ্জারী কমলাকান্তকে চিনিত; সে যষ্টি দেখিয়া বিশেষ ভীত হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কেবল আমার মুখপানে চাহিয়া হাই তুলিয়া, একটু সরিয়া বসিল। বলিল, "মেও!" প্রশ্ন বুঝিতে পারিয়া যষ্টি ত্যাগ করিয়া পুনরপি শয্যায় আসিয়া হুঁকা লইলাম। তখন দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া, মার্জ্জারের বক্তব্যসকল বুঝিতে পারিলাম।

বুঝিলাম যে, বিড়াল বলিতেছে, "মারপিট কেন? স্থির হইয়া হুঁকা হাতে করিয়া, একটু বিচার করিয়া দেখ দেখি? এ সংসারে ক্ষীর, সর, দুগ্ধ, দধি, মৎস্য, মাংস, সকলই তোমরা খাইবে, আমরা কিছু পাইব না কেন? তোমরা মনুষ্য, আমরা বিড়াল, প্রভেদ কি? তোমাদের ক্ষুৎপিপাসা আছে–আমাদের কি নাই? তোমরা খাও, আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু আমরা খাইলেই তোমরা কোন্ শাস্ত্রানুসারে ঠেঙ্গা লাঠি লইয়া মারিতে আইস, তাহা আমি বহু অনুসন্ধানে পাইলাম না। তোমরা আমার কাছে কিছু উপদেশ

গ্রহণ কর। বিজ্ঞ চতুষ্পদের কাছে শিক্ষালাভ ব্যতীত তোমাদের জ্ঞানোন্নতির উপায়ান্তর দেখি না। তোমাদের বিদ্যালয়সকল দেখিয়া আমার বোধ হয়, তোমরা এত দিনে এ কথাটি বুঝিতে পারিয়াছ।

"দেখ, শয্যাশায়ী মনুষ্য! ধর্ম্ম কি? পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। এই দুগ্ধটুকু পান করিয়া আমার পরম উপকার হইয়াছে। তোমার আহরিত দুগ্ধে এই পরোপকার সিদ্ধ হইল-অতএব তুমি সেই পরম ধর্ম্মের ফলভাগী-আমি চুরিই করি, আর যাই করি, আমি তোমার ধর্ম্মসঞ্চয়ের মূলীভূত কারণ। অতএব আমাকে প্রহার না করিয়া, আমার প্রশংসা কর। আমি তোমার ধর্ম্মের সহায়।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ, যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষাও অধার্ম্মিক। তাঁহাদের চুরি করিবার প্রয়োজন নাই বলিয়াই চুরি করেন না। কিন্তু তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরের প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম্ম চোরের নহে-চোরে যে চুরি করে, সে অধর্ম্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?

"দেখ, আমি প্রাচীরে প্রাচীরে মেও মেও করিয়া বেড়াই, কেহ আমাকে মাছের কাঁটাখানাও ফেলিয়া দেয় না। মাছের কাঁটা, পাতের ভাত, নর্দমায় ফেলিয়া দেয়, জলে ফেলিয়া দেয়, তথাপি আমাকে ডাকিয়া দেয় না। তোমাদের পেট ভরা, আমার পেটের ক্ষুধা কি প্রকারে জানিবে! হায়! দরিদ্রের জন্য ব্যথিত হইলে তোমাদের কি কিছু অগৌরব আছে? আমার মত দরিদ্রের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া, লজ্জার কথা সন্দেহ নাই। যে কখন অন্ধকে মুষ্টি-ভিক্ষা দেয় না, সেও একটা বড় রাজা, ফাঁপরে পড়িলে রাত্রে ঘুমায় না-সকলেই পরের ব্যথায় ব্যথিত হইতে রাজি। তবে ছোটলোকের দুঃখে কাতর! ছি! কে হইবে?

"দেখ, যদি অমুক শিরোমণি, কি অমুক ন্যায়ালঙ্কার আসিয়া তোমার দুধটুকু খাইয়া যাইতেন, তবে তুমি কি তাঁহাকে ঠেঙ্গা লইয়া মারিতে আসিতে? বরং যোড়হাত করিয়া বলিতে, আর একটু কি আনিয়া দিব? তবে আমার বেলা লাঠি কেন? তুমি বলিবে, তাঁহারা অতি পণ্ডিত, বড় মান্য লোক। পণ্ডিত বা মান্য বলিয়া কি আমার অপেক্ষা তাঁহাদের ক্ষুধা বেশী? তা ত নয়-তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ-দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না। যে খাইতে বলিলে বিরক্ত হয়, তাহার জন্য ভোজের আয়োজন কর-আর যে ক্ষুধার জ্বালায় বিনা আহ্বানেই তোমার অন্ন খাইয়া ফেলে, চোর বলিয়া তাহার দণ্ড কর-ছি! ছি!

"দেখ, আমাদিগের দশা দেখ, দেখ প্রাচীরে প্রাচীরে, প্রাঙ্গণে প্রাঙ্গণে, প্রাসাদে, প্রাসাদে, মেও মেও করিয়া আমরা চারি দিক্ দৃষ্টি করিতেছি-কেহ আমাদিগকে মাছের কাঁটাখানা ফেলিয়া দেয় না। যদি কেহ তোমাদের সোহাগের বিড়াল হইতে পারিল-গৃহমার্জ্জার হইয়া বৃদ্ধের নিকট যুবতী ভার্য্যার সহোদর, বা মূর্খ ধনীর কাছে সতরঞ্চ খেলওয়ারের স্থানীয় হইয়া থাকিতে পারিল-তবেই তাহার পুষ্টি। তাহার লেজ ফুলে, গায়ে লোম হয়, এবং তাহাদের রূপের ছটা দেখিয়া, অনেক মার্জ্জার কবি হইয়া পড়ে।

"আর, আমাদিগের দশা দেখ-আহারাভাবে উদর কৃশ, অস্থি পরিদৃশ্যমান, লাঙ্গুল বিনত, দাঁত বাহির হইয়াছে-জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে-অবিরত আহারাভাবে ডাকিতেছি, 'মেও! মেও! খাইতে পাই না!'- আমাদের কালো চামড়া দেখিয়া ঘৃণা করিও না! এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও-নহিলে চুরি করিব। আমাদের কৃষ্ণ চর্ম্ম, শুষ্ক মুখ, ক্ষীণ সকরুণ মেও মেও

শুনিয়া তোমাদিগের কি দুঃখ হয় না? চোরের দণ্ড আছে, নির্দ্দয়তার কি দণ্ড নাই? দরিদ্রের আহার সংগ্রহের দণ্ড আছে, ধনীর কার্পণ্যের দণ্ড নাই কেন? তুমি কমলাকান্ত, দূরদর্শী, কেন না আফিংখোর, তুমিও কি দেখিতে পাও না যে, ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়? পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে'; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।"

আমি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলাম, "থাম! থাম মার্জ্জারপণ্ডিত! তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিষ্টিক্! সমাজবিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধনসঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধনসঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।"

মার্জ্জার বলিল, "না হইলে ত আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি। ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

আমি বুঝাইয়া বলিলাম যে, "সামাজিক ধনবৃদ্ধি ব্যতীত সমাজের উন্নতি নাই।" বিড়াল রাগ করিয়া বলিল যে, "আমি যদি খাইতে না পাইলাম, তবে সমাজের উন্নতি লইয়া কি করিব?"

বিড়ালকে বুঝান দায় হইল। যে বিচারক বা নৈয়ায়িক, কস্মিন্‌ কালে কেহ তাহাকে কিছু বুঝাইতে পারে না। এ মার্জ্জার সুবিচারক, এবং সুতার্কিকও বটে, সুতরাং না বুঝিবার পক্ষে ইহার অধিকার আছে। অতএব ইহার উপর রাগ না করিয়া বলিলাম, "সমাজের উন্নতিতে দরিদ্রের প্রয়োজন না থাকিলে না থাকিতে পারে, কিন্তু ধনীদিগের বিশেষ প্রয়োজন, অতএব চোরের দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য।"

মার্জ্জারী মহাশয়া বলিলেন, "চোরকে ফাঁসি দাও, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার সঙ্গে আর একটি নিয়ম কর। যে বিচারক চোরকে সাজা দিবেন, তিনি আগে তিন দিবস উপবাস করিবেন। তাহাতে যদি তাঁহার চুরি করিয়া খাইতে ইচ্ছা না করে, তবে তিনি স্বচ্ছন্দে চোরকে ফাঁসি দিবেন। তুমি আমাকে মারিতে লাঠি তুলিয়াছিলে, তুমি অদ্য হইতে তিন দিবস উপবাস করিয়া দেখ। তুমি যদি ইতিমধ্যে নসীরাম বাবুর ভাণ্ডারঘরে ধরা না পড়, তবে আমাকে ঠেঙ্গাইয়া মারিও, আমি আপত্তি করবি না।"

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে, তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে। আমি সেই প্রথানুসারে মার্জ্জারকে বলিলাম যে, "এ সকল অতি নীতিবিরুদ্ধ কথা, ইহার আন্দোলনেও পাপ আছে। তুমি এ সকল দুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাচরণে মন দাও। তুমি যদি চাহ, তবে পাঠার্থে তোমাকে আমি নিউমান ও পার্করের গ্রন্থ দিতে পারি। আর কমলাকান্তের দপ্তর পড়িলেও কিছু উপকার হইতে পারে–আর কিছু হউক বা না হউক, আফিঙ্গের অসীম মহিমা বুঝিতে পারিবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, প্রসন্ন কাল কিছু ছানা দিবে বলিয়াছে, জলযোগের সময় আসিও, উভয় ভাগ করিয়া খাইব। অদ্য আর কাহারও হাঁড়ি খাইও না; বরং ক্ষুধায় যদি নিতান্ত অধীরা হও, তবে পুনর্ব্বার আসিও, এক সরিষাভোর আফিঙ্গ দিব।"

মার্জ্জার বলিল, "আফিঙ্গের বিশেষ প্রয়োজন নাই, তবে হাঁড়ি খাওয়ার কথা, ক্ষুধানুসারে বিবেচনা করা যাইবে।"

মার্জ্জার বিদায় হইল। একটি পতিত আত্মাকে অন্ধকার হইতে আলোকে আনিয়াছি, ভাবিয়া কমলাকান্তের বড় আনন্দ হইল!

শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

১৪. ঢেঁকি

আমি ভাবি কি, যদি পৃথিবীতে ঢেঁকি না থাকিত, তবে খাইতাম কি? পাখীর মত দাঁড়ে বসিয়া ধান খাইতাম? না লাঙ্গুলকর্ণদুল্যমানা গজেন্দ্রগামিনী গাভীর মত মরাইয়ে মুখ দিতাম? নিশ্চয় তাহা আমি, পারিতাম না। নবযুবা কৃষ্ণকায় বস্ত্রশূন্য কৃষাণ আসিয়া আমার পঞ্জরে যষ্টিপাত করিত, আর আমি ফোঁস্ করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া শৃঙ্গ লাঙ্গুল লইয়া পলাইতাম। আর্য্যসভ্যতার অনন্ত মহিমায় সে ভয় নাই–ঢেঁকি আছে–ধান চাল হয়। আমি এই পরোপকরাররনিরত ঢেঁকিকে আর্য্যসভ্যতার এক বিশেষ ফল মনে করি–আর্য্যসাহিত্য, আর্য্যদর্শন আমার মনে ইহার কাছে লাগে না–রামায়ণ, কুমারসম্ভব, পাণিনি, পতঞ্জলি, কেহ ধানকে চাল করিতে পারে না। ঢেঁকিই আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,-শ্রাদ্ধাধিকারী,-নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। শুধু কি ঢেঁকিশালের্য? সমাজে, সাহিত্যে, ধর্ম্মসংস্কারে, রাজসভায়,-কোথায় না ঢেঁকি আর্য্যসভ্যতার মুখোজ্জ্বলকারী পুত্র,-শ্রাদ্ধাধিকারী,-নিত্য পিণ্ডদান করিতেছে। দুঃখের মধ্যে ইহাতেও আর্য্যসভ্যতার মুক্তিলাভ করিল না, আজিও ভূত হইয়া রহিয়াছে। ভরসা আছে, কোন ঢেঁকি অচিরাৎ তাহার গয়া করিবে। ঢেঁকির এই অপরিমেয় মাহাত্ম্যের কারণানুসন্ধানে আমি বড় সমুৎসুক হইলাম। এ ঊনবিংশ শতাব্দী, বৈজ্ঞানিক সময়–অবশ্য কারণ অনুসন্ধান করিতে হয়। কোথা হইতে ঢেঁকির এই কার্য্যদক্ষতা! এই পরোপকারে মতি! এই Public spirit? না বস্তু না বস্তুসিদ্ধি?-বিনা কারণে কি ইহা জন্মে? অনুসন্ধাননার্থ আমি ঢেঁকিশালে গেলাম। দেখিলাম, ঢেঁকি খানায় পড়িতেছে। বিন্দুমাত্র মদ্যপান করে নাই, তথাপি পুনঃ পুনঃ খানায় পড়িতেছে, উঠিতেছে, বিরতি নাই। ভাবিলাম, মুহুর্ম্মহঃ খানায় পড়াই কি এত মাহাত্ম্যের কারণ? ঢেঁকি খানায় পড়ে বলিয়াই কি এত পরোপকারে মতি? এতটা Public spirit? ভাবিলাম–না, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, আমার রামচন্দ্র ভায়াও দুই বেলা খানায় পড়িয়া থাকেন–কিন্তু কই, তাঁহার ত কিছু মাত্র Public spirit নাই। শৌণ্ডিকালয়ের বাহিরে ত তাঁহার পরোপকার কিছু দেখিনা। আরও–মনের কথা লুকাইয়া কি হইবে? আমিও–আমি শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী স্বয়ং, একদিন খানায় পড়িয়াছিলাম। দ্রাক্ষারসের বিকার বিশেষের সেবনে আমার গর্ত্তলোক প্রাপ্তি ঘটে নাই–কারণান্তরে। প্রসন্ন গোয়ালিনী–গোপাঙ্গনাকুল–কলঙ্কিনী,-এক দিন তাহার মঙ্গলা গাইকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ছাড়িবামাত্র মঙ্গলা, ঊর্দ্ধপুচ্ছে, প্রণতশৃঙ্গে ধাবমানা! কি ভাবিয়া মঙ্গলা ছুটিল তা বলিতে পারি না,-স্ত্রীজাতি ও গোজাতির মনের কথা কি প্রকারে বলিব? কিন্তু আমি ভাবিলাম, আমিই তাহার উভয় শৃঙ্গের একমাত্র লক্ষ্য। তখন আমি কটিদেশ দৃঢ়তার বদ্ধ করিয়া, সদর্পে বদ্ধপরিকর হইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নমান! পশ্চাতে সেই ভীষণা ঘটোঘ্নি রাক্ষসী! আমিও যত দৌড়াই, সেও তত দৌড়ায়। কাজেই, দৌড়ের চোটে ওচট খাইয়া, গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে, চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রের ন্যায় গড়াইতে গড়াইতে গড়াইতে–বিবরলোক প্রাপ্তি! "আলু থালু কেশপাশ, মুখে না বহিছে শ্বাস"-হায়! তখন কি আমার হৃদয়–আকাশমধ্যে Public spirit রূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছিল? না হইয়াছিল এমত নহে। তখন আমি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, বসুন্ধরা যদি গোশূন্য হয়েন, আর নারিকেল, তাল, খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে দুগ্ধনিঃসরণ হয়, তবে এই দুগ্ধপোষ্য বাঙ্গালিজাতির বিশেষ উপকার হয়। তাহারা শৃঙ্গভীতিশূন্য হইয়া দুগ্ধ পান করিতে থাকে। সে দিন সেই বিবরপ্রাপ্তি হেতু আমার পরহিতকামনা এত দূর প্রবল হইয়াছিল যে, আমি প্রসন্নকে সময়ান্তরে বলিয়াছিলাম, "অয়ি দধিদুগ্ধক্ষীরনবনীত–পরিবেষ্টিতা গোপকন্যে! তুমি গোরুগুলি বিক্রয় করিয়া স্বয়ং লাউ ভুসি খাইতে থাক, তুমি স্বয়ং ঘটোঘ্নী হইয়া বহুতর দুগ্ধপোষ্য প্রতিপালন করিতে পারিবে,-কাহাকেও গুঁতাইও না।" প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন হঠাৎ সম্মার্জ্জনী হস্তে গ্রহণ করায়, সে দিন আমাকে পরহিতব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। অতএব পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য "সাধারণ আত্মা" অর্থাৎ Public spirit, বিশেষতঃ কার্য্যদক্ষতা, এ সকল খানায়, পড়িলে হয় কি না? যদি না হয়, তবে ঢেঁকির এ

কার্য্যদক্ষতা, এ মহাবল কোথা হইতে আসিল? আমি এই কূটতর্কের মীমাংসার জন্য সন্দিহানচিত্তে ভাবিতেছিলাম, এমত সময়ে মধুরকণ্ঠে কে বলিল, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! হাঁ করিয়া কি ভাবিতেছ? ঢেঁকি কখনও দেখ নাই?" চাহিয়া দেখিলাম, তরঙ্গিণী মাতঙ্গিনী দুই ভগিনী ঢেঁকিতে পাড় দিতেছে। সে দিকে এতক্ষণ চাহিয়া দেখি নাই। হাতী দেখিতে গিয়া অন্ধ কেবল শুণ্ড দেখিয়াছিল, আমিও ঢেঁকি দেখিতে গিয়া কেবল ঢেঁকির শুঁড় দেখিতেছিলাম। পিছনে যে দুই জনের দুইখানি রাঙ্গা পা ঢেঁকির পিঠে পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই! দেখিবামাত্র যেন কে আমার চোখের ঠুলি খুলিয়া লইল। আমার দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল-কার্য্যকারণসম্বন্ধ পরম্পরা আমার চক্ষে প্রখর সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হইল। ঐ ত ঢেঁকির বল!-ঐ ত ঢেঁকির মাহাত্ম্যের মূল কারণ!-ঐ রমণীপাদপদ্ম! ধপাধপ পাদপদ্ম পিঠে পড়িতেছে, আর ঢেঁকি ধান ভানিয়া চাল করিতেছে। উঠিয়া পড়িয়া-ঢক ঢক কচ কচ! কত পরোপকারই করিতেছে! হায় ঢেঁকি! ও পায়ের কি এত গুণ! পিঠে পাইয়া তুমি এই সাত কোটি বাঙ্গালিকে অন্ন দিতেছ-তার উপর আবার দেবতার ভোগ দিতেছ! এস, মেয়েমানুষের শ্রীচরণ! তুমি ভাল করিয়া ঢেঁকির পিঠে পড়, আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইয়া তোমায়-হায়! কি করিব?-কাঁসার মল পরাই! আর ভাই, ঢেঁকির দল! তোমাদের বিদ্যা বুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান,-নহিলে কেবল কাঠ-দারুময়-গর্ত্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে থানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে "ধান্য" ; পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা। আবার শুনিতে পাই, তোমাদের একটি বিশেষ গুণ আছে নাকি?-ঘরে থাকিয়া নাকি মধ্যে মধ্যে কুমীর হও? আর ভাই ঢেঁকি, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি-মধ্যে মধ্যে স্বর্গে যাওয়া হয় শুনিয়াছি, সত্য সত্যই কি সেখানে গিয়াও ধান ভানিতে হয়? দেবতারা সকলে অমৃত খায়, পারিজাত লোফে, অপ্সরা লইয়া ক্রীড়া করে, মেঘে চড়ে, বিদ্যুৎ ধরে, রতি রতিপতির সঙ্গে লুকোচুরি খেলে-তুমি নাকি ততক্ষণ কেবল ঘেচর ঘেচর করিয়া ধান ভান? ধন্য সাধ্য ভাই তোমার! ঢেঁকি কোন উত্তর দিল না, কেবলই ধান ভানে। রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলাম-একেবারে কমলাশ্রমে। কমলাশ্রমটা কি? ৺নসীবাবু সম্প্রতি ধান ভানিতে গিয়াছেন। নিপ্রত্যাশী নাপিতানী একখানি ভাঙ্গা চালা ঘর রাখিয়া উত্তরাধিকারি-বিরহিতা হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে-ঘরখানির এমনি অবস্থা যে, আর কেহ তাহার কামনা করিল না-সুতরাং আমি তাহাতে কমলাশ্রম করিয়াছি-কেবল কমলাকান্তের আশ্রম নহে-সাক্ষাৎ কমলার আশ্রম। আমি সেইখানে চারপাইর উপর পড়িয়া আফিঙ্গ চড়াইলাম। তখন চক্ষু বুজিয়া আসিল। জ্ঞাননেত্র উদয় হইল। দেখিলাম, এ সংসার কেবল ঢেঁকিশাল। বড় বড় ইমারত, বৈঠকখানা, রাজপুরী সব ঢেঁকিশালা-তাহাতে বড় বড় ঢেঁকি, গড়ে নাক পুরিয়া, খাড়া হইয়া রহিয়াছে; কোথাও জমিদাররূপে ঢেঁকি প্রজাদিগের হৃৎপিণ্ড গড়ে পিষিয়া, নূতন নিরিখ রূপ চাউল বাহির করিয়া সুখে সিদ্ধ করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন। কোথাও আইনকারক ঢেঁকি, মিনিট রিপোর্টের রাশি গড়ে পিষিয়া, ভানিয়া বাহির করিতেছেন-আইন; বিচারক ঢেঁকি সেই আইনগুলি গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন-দারিদ্র, কারাবাস-ধনীর ধনান্ত-ভাল মানুষের দেহান্ত। বাবু ঢেঁকি, বোতল গড়ে পিতৃধন পিষিয়া বাহির করিতেছেন-পিলে যকৃৎ; তাঁর গৃহিণী ঢেঁকি একাদশীর গড়ে বাজার খরচ পিষিয়া বাহির করিতেছেন-অনাহার। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক দেখিলাম লেখক ঢেঁকি-সাক্ষাৎ মা সরস্বতীর মুণ্ড ছাপার গড়ে পিষিয়া বাহির করিতেছেন-স্কুলবুক! দেখিতে দেখিতে দেখিলাম-আমিও একটা মস্ত ঢেঁকি-কমলাশ্রমে লম্বমান হইয়া পড়িয়া আছি, নেশার গড়ে মনোদুঃখ ধান্য পিষিয়া দপ্তর চাউল বাহির করিতেছি। মনে মনে অহঙ্কার জন্মিল-এমন চাউল ত কাহারও গড়ে হইতেছে না। তখন ইচ্ছা হইল-এ চাউল মনুষ্য-লোকের উপযুক্ত নহে, আমি স্বর্গে গিয়া ধান ভানিব। তখনই স্বর্গে গেলাম-"অশ্বমনোরথে"। স্বর্গে গিয়া, দেবরাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "হে দেবেন্দ্র! আমি শ্রীকমলাকান্ত ঢেঁকি-স্বর্গে ধান ভানিব।" দেবেন্দ্র বলিলেন, "আপত্তি কি-পুরস্কার চাই কি?" আমি। উর্ব্বশী

মেনকা রম্ভা। দেবরাজ। উর্ব্বশী মেনকা পাইবে না–আর যাহা চাহিলে তাহা ত মর্ত্ত্যলোকেও তুমি পাইয়া থাক,-আটটার হিসাবে। আমি দুর্ম্মুখ–বলিলাম, "কি ঠাকুর, অষ্টরম্ভা! সে কি আজকাল নরলোকের পাবার যো আছে? সে আজকাল দেবতাদেরই একচেটে।" সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজ আমাকে বকশিশ হুকুম করিলেন,-এক সের অমৃত, আর এক ঘন্টার জন্য উর্ব্বশীর সঙ্গীত। চৈতন্য হইয়া দেখিলাম, পাশে ঘটিতে এক সের দুগ্ধ,-আর প্রসন্ন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছি–"নেশাখোর!" "বিট্‌লে!" "পেটার্থী!" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি উর্ব্বশীকে বলিলাম, "বাইজি! এক ঘন্টা হইয়াছে–এখন বন্ধ কর।"

কমলাকান্তের

পত্র

০১. কি লিখিব?

পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বঙ্গদর্শন 16
সম্পাদক মহাশয়
শ্রীচরণকমলেষু।

আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রীনসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীস, জুয়াচোর লোক আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম–আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন। বিক্রয় কথাটি আপনি স্বীকার করেন নাই, কিন্তু আমি জানি, ভীষ্মদেব ঠাকুর বিনামূল্যে শালগ্রামকে তুলসী দেন না, বিনামূল্যে যে আপনাকে শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত দপ্তর দিবেন, এমন সম্ভাবনা অতি বিরল। এই জুয়াচুরির কথা আমি এত দিন জানিতাম না। দৈবাধীন একটি যোড়া জুতা কিনিয়া এ সন্ধান পাইলাম। একখানি ছাপার কাগজে জুতা যোড়াটি বান্ধা ছিল, দেখিয়া ভাবিতেছিলাম যে, কাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইল যে, তাহার রচনা শ্রীমৎ কমলাকান্ত শর্ম্মার চরণযুগলের ব্যবহার্য্য পাদুকাদ্বয় মণ্ডন করিতেছে। মনে করিলাম, সার্থক তাহার লেখনীধারণ! সার্থক তাহার নিশীথ-তৈলদাহ! মূর্খের দ্বারা তাহার রচনা পঠিত না হইয়া সাধু জনের চরণের সঙ্গে যে কোন প্রকার সম্বন্ধযুক্ত হইয়াছে, ইহা বঙ্গীয় লেখকের সৌভাগ্য। এই ভাবিয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া পড়িয়া দেখিলাম যে, কাগজখানি কি। পড়িলাম, উপরে লেখা আছে, "বঙ্গদর্শন"। ভিতরে লেখা আছে, "কমলাকান্তের দপ্তর।" তখন বুঝিলাম যে, আমারি এ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির ফল।

আরও একটু কৌতুহল জন্মিল। বঙ্গদর্শন কি, তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "মহাশয়, বঙ্গদর্শনটা কি, তাহা বলিতে পারেন?" তিনি অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ পরে মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।" আমি তাঁহার পাণ্ডিত্যের অনেক প্রশংসা করিলাম, কিন্তু অগত্যা অন্য বন্ধুকেও ঐ প্রশ্ন করিতে হইল। অন্য বন্ধু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি "বঙ্গদশন," অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত। আমি তাঁহাকে চতুষ্পাঠী খুলিতে পরামর্শ দিয়া অন্য এক সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বঙ্গ শব্দে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্যখ্যা করিয়া বলিলেন, "ইহার অর্থ পূর্ব্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি"; অর্থাৎ "A Guide to Eastern Bengal." এইরূপ বহু প্রকার অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্ম্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে। এক্ষণে আবার শুনিতেছি, কোন ধনুর্দ্ধর ঐ দপ্তরগুলি নিজপ্রণীত বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন। আরও কত হবে!

অতএব হে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক মহাশয়! অবগত হউন যে, আমি শ্রীকমলাকান্ত শর্ম্মা সশরীরে ইহজগতে অদ্যাপি অধিষ্ঠান করিতেছি এবং আপনাদিগের বিশেষ আপত্তি থাকিলেও আরও কিছুদিন অধিষ্ঠান করিব, এমত ইচ্ছা রাখি।

এক্ষণে কি জন্য আপনাকে অদ্য পত্র লিখিতেছি, তাহা অবগত হউন। উপরে দেখিতে পাইবেন,

"শ্রীশ্রী৺নসিধাম" লিখিয়াছি। অর্থাৎ আমার নসিবাবু শ্রীশ্রী৺ ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছেন! ভরসা করি যে, তিনি সর্ব্বাশ্রয় শ্রীপাদপদ্মে পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাঁহার গতি কোন্ পথে হইয়াছে, তাহার নিশ্চিত সম্বাদ আমি রাখি না। কেবল ইহাই জানি যে, ইহলোকে তিনি নাই। অতএব আমারও আশ্রয় নাই! অহিফেনের কিছু গোলযোগ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার কিছু বন্দোবস্ত করিতে পারেন? আমার দপ্তরের জন্য আপনি খোশনবীস মহাশয়কে কি দিয়াছিলেন বলিতে পারি না; কিন্তু আমাকে এক আধ পোয়া আফিঙ্গ পাঠাইলেই (আমার মাত্রা কিছু বেশী) আমি এক একটি প্রবন্ধ পাঠাইতে পারিব। আপনার মঙ্গল হউক! আপনি ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবেন না।

কিন্তু আপনার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত পাকাপাকি করিবার আগে, গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা আছে। এ কমলাকান্তি কলে, ফরমাসের মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়–আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিকতত্ত্ব রসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ করে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশ্যন ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশন বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতে আমার কোটেশ্যন সংগ্রহ করা হইয়াছে–আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশ্যন, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না। যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন। আমি স্বয়ং সে দিকে কিছু করিতে পারি না পারি, আমার এক বড় সহায় জুটিয়াছে। ভীষ্মদেব খোশনবীস মহাশয়ের পুত্র যিনি ইউটিলিটি শব্দের আশ্চর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন17, তাঁহাকে আপনার স্মরণ থাকিতে পারে। তিনি এক্ষণে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। এম, এ, পাস করিয়া বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়াছেন। গুরু বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার। ইস্কুলের বহি চাই কি? তিনি বর্ণপরিচয় হইতে রোমদেশের ইতিহাস পর্য্যন্ত সকলই লিখিতে পারেন। ন্যাচরল্ হিষ্টরির একশেষে করিয়া রাখিয়াছেন; পুরাতন পেনি–মেগেজিন্ হইতে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং গোল্ডস্মিথ কৃত এনিমেটেড় নেচরের সারাংশ সঙ্কলন করিয়া রাখিয়াছেন। সে সব চাই কি? গুরুর মধ্যে গুরু যে পাটীগণিত এবং জ্যামিতি, তাহাতেও সাহসশূন্য নহেন। জ্যামিতি এবং ত্রিকোণমিতি চুলোয় যাক, চতুষ্কোণমিতিতেও তাঁহার অধিকার–দৈববিদ্যাবলে তিনি আপনার পৈতৃক চতুষ্কোণ পুকুরটিও মাপিয়া ফেলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, শুনিয়া লোকে ধন্য ধন্য করিয়াছিল। তাহার ঐতিহাসিক কীর্ত্তির কথা কি বলিব? তিনি চিতোরের রাজা আলফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবন–চরিত দশ–পনের পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য–সমালোচন বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত ও হর্বট স্পেন্সরের মত খণ্ডন আছে; এবং ডারুইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে মালতীমাধব হইতে চারি পাঁচটা শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সুতরাং এখানি মোটের উপরে ভারি রকমের গুরুবিষয়ক গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। ভরসা করি, সমালোচনাকালে আপনারা বলিবেন, বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অদ্বিতীয়।

ভরসা করি, গুরু বিষয় ছাড়িয়া লঘু বিষয়ে আপনার অভিরুচি হইবে না। কেন না, সে সকলের কিছু অসুবিধা। খোশনবীসপুত্র একখানি নাটকের সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখিয়াছেন বটে; নায়িকার নাম চন্দ্রকলা কি শশিরম্ভা রাখিবেন স্থির করিয়াছেন;-তাঁহার পিতা বিজয়পুরের রাজা ভীমসিংহ; আর নায়ক আর একটা কিছু সিংহ; এবং শেষ অঙ্কে শশিরম্ভা নায়কের বুকে ছুরি মারিয়া আপনি হা হুতোহস্মি করিয়া পুড়িয়া মরিবেন, এই সকল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু নাটকের আদ্য ও মধ্যভাগ কি প্রকার হইবে, এবং অন্যান্য "নাটকোল্লিখিত ব্যক্তিগণ" কিরূপ করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন; এবং আমি শপথ পূর্ব্বক আপনার নিকট বলিতে পারি যে, যে কুড়ি ছত্র লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে আটটা "হা, সখি!" এবং তেরটা "কি হলো! কি হলো!" সমাবেশ করিয়াছেন। শেষে একটি গীতও দিয়াছেন-নায়িকা ছুরি হস্তে করিয়া গায়িতেছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নাটকের অন্যান্য অংশ কিছুই লেখা হয় নাই।
যদি নবেলে আপনার আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা হইলেও আমরা অর্থাৎ খোশনবীস কোম্পানী কিছু অপ্রস্তুত নহি। আমরা উত্তম নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইক্সোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্য্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে।
যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না-আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে অমিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব। সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমুতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য-দুই চারিটা নামের প্রভেদ আছে মাত্র। চাই?
আর যদি লঘু গুরু সব ছাড়িয়া, খোশনবিসী রচনা ছাড়িয়া, সাফ কমলাকান্ত ঢঙে আপনার রুচি হয়, তবে তাও বলুন, আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই। মনে থাকে যেন, তাহার বিনিময়ে আফিঙ্গ লইব! ওজন কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইব-এক তিল ছাড়িব না! আপনি কি রাজি? আপনি রাজি হউন বা না হউন, আমি রাজি।

\-\-\-\-\-\-\-\-

16 "কমলাকান্তের দপ্তর" বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়। যখন এই পত্রগুলি বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন সঞ্জীব বাবু ইহার সম্পাদক।
17 ইউ-টিল-ইটি-আই।

০২. পলিটিক্‌স্

শ্রীচরণেষু, আফিঙ্গ পাইয়াছি। অনেকটা আফিঙ্গ পাঠাইয়াছেন- শ্রীচরণকমলেষু।
আপনার শ্রীচরণকমলযুগলেষু-আরও কিছু আফিঙ্গ পাঠাইবেন।
কিন্তু শ্রীচরণকমলযুগল হইতে কমলাকান্তের প্রতি এমন কঠিন আজ্ঞা কি জন্য হইয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। আপনি লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে নয় আইনে অন্যত্র কিছু পলিটিক্‌স্ কম পড়িবে-তুমি কিছু পলিটিক্‌স্ ঝাড়িলে ভাল হয়। কেন মহাশয়? আমি কি দোষ করিয়াছি যে পলিটিক্‌স্ সঙ্কেক্টরূপী ঝামা ইট মাথায় মারিব? কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্‌স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে-আফিঙ্গ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়োচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্‌স্ লিখিতে বলেন? আপনি আমার দপ্তর পাঠ করিয়াছেন, কোথায় আমার এমন স্থূল বুদ্ধির চিহ্ন পাইলেন যে, আমাকে পলিটিক্‌স্ লিখিতে বলেন? আফিঙ্গের জন্য আমি আপনার খোশামোদ করিয়াছি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া আমি এমন স্বার্থপর চাটুকার অদ্যাপি হই নাই যে, পলিটিক্‌স্ লিখি। ধিক্ আপনার সম্পাদকতায়! ধিক্ আফিঙ্গ দানে! আপনি আজিও বুঝিতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্ম্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশান নহে।
আপনার এই আদেশ প্রাপ্তে বড়ই মনঃক্ষুন্ন হইয়া এক পতিত বৃক্ষের কাণ্ডোপরি উপবেশন করিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ভাবিতেছিলাম। কি করি! ভরিটাক্ আফিঙ্গ গলদেশের অধোভাগে যেন তেন প্রকারেণ প্রেরণ করিলাম। সম্মুখে শিবে কলুর বাড়ী-বাড়ীর প্রাঙ্গণে দুই তিনটা বলদ বাঁধা আছে-মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল। আমি কতকটা স্থিরচিত্ত হইলাম-এখানে ত পলিটিক্‌স্ নাই। এই নাদার মধ্য হইতে গোগণ পলিটিক্‌স্-বিকার-শূন্য অকৃত্রিম সুখ পাইতেছে-দেখিয়া কিছু তৃপ্ত হইলাম। তখন অহিফেন-প্রসন্ন চিত্তে লোকের এই পলিটিক্‌স্-প্রিয়তা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার তখন বিদ্যাসুন্দর যাত্রার একটি গান মনে পড়িল।

বোবার ইচ্ছা কথা ফুটে,
খোঁড়ার ইচ্ছা বেড়ায় ছুটে,
তোমার ইচ্ছা বিদ্যা ঘটে
ইচ্ছা বটে ইত্যাদি।

আমাদের ইচ্ছা পলিটিক্‌স্-হপ্তায় হপ্তায় রোজ রোজ পলিটিক্‌স্; কিন্তু বোবার বাকচাতুরীর কামনার মত, খঞ্জের দ্রুতগমনের আকাঙ্ক্ষার মত, অন্ধের চিত্রদর্শনলালসার মত, হিন্দু বিধবার স্বামিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষার মত, আমার মনে আদরের আদরিণী গৃহিণীর আদরের সাধের মত হাস্যাস্পদ, ফলিবার নহে। ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!" ইহাই তাহাদের পলিটিক্‌স্! তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

এইরূপ ভাবিতেছিলাম, ইত্যবসরে দেখিলাম, শিবু কলুর পৌত্র দশমবর্ষীয় বালক, এক কাঁসি ভাত আনিয়া উঠানে বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। দূর হইতে একটি শ্বেতকৃষ্ণ কুক্কুর তাহা দেখিল। দেখিয়া, একবার দাঁড়াইয়া, চাহিয়া চাহিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে জিহ্বা নিষ্কৃত করিল। অমল-ধবল অন্নরাশি কাংস্যপাত্রে কুসুমদামবৎ বিরাজ করিতেছে-কুকুরের পেটটা দেখিলাম, পড়িয়া আছে। কুক্কুর চাহিয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, একবার আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া হাই তুলিল।

তার পর ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে ধীরে এক এক পদ অগ্রসর হইল, এক এক বার কলুর পুত্রের অন্নপরিপূরিত বদন প্রতি আড়নয়নে কটাক্ষ করে, এক এক পা এগোয়। অকস্মাৎ অহিফেন-প্রসাদে দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলাম-দেখিলাম, এই ত পলিটিক্স,-এই কুক্কুর ত পলিটিশান! তখন মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলাম যে, কুক্কুর পাকা পলিটিকেল চাল চালিতে আরম্ভ করিল। কুক্কুর দেখিল-কলুপুত্র কিছু বলে না-বড় সদাশয় বালক, কুক্কুর কাছে গিয়া, থাবা পাতিয়া বসিল। ধীরে ধীরে লাঙ্গুল নাড়ে, আর কলুর পোর মুখপানে চাহিয়া, হ্যা-হ্যা করিয়া হাঁপায়। তাহার ক্ষীণ কলেবর, পাতলা পেট, কাতর দৃষ্টি এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস দেখিয়া কলুপুত্রের দয়া হইল, তাহার পলিটিকেল্ এজিটেশ্যন সফল হইল;-কলুপুত্র একখানা মাছের কাঁটা উত্তম করিয়া চুষিয়া লইয়া, কুক্কুরের দিকে ফেলিয়া দিল। কুক্কুর আগ্রহ সহকারে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া, তাহা চর্ব্বণ, লেহন, গেলন এবং হজমকরণে প্রবৃত্ত হইল। আনন্দে তাহার চক্ষু বুজিয়া আসিল।

যখন সেই মৎস্যকন্টকসম্বন্ধে এই সুমহৎ কার্য্য উত্তমরূপে সমাপন হইল, তখন সেই সুচতুর পলিটিশানের মনে হইল যে, আর একখানা কাঁটা পাইলে ভাল হয়। এইরূপ ভাবিয়া, পলিটিশান আবার বালকের মুখপানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, বালক আপনমনে গুড় তেঁতুল মাখিয়া ঘোর রবে ভোজন করিতেছে-কুক্কুর পানে আর চাহে না। তখন কুক্কুর একটি bold move অবলম্বন করিল-জাত পলিটিশান, না হবে কেন? সেই রাজনীতিবিদ্ সাহসে ভর করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া বসিলেন। আর এক বার হাই তুলিলেন। তাহাতেও কলুর ছেলে চাহিয়া দেখিল না। অতঃপর কুক্কুর মৃদু মৃদু শব্দ করিতে লাগিলেন। বোধ হয় বলিতেছিলেন, হে রাজ্যধিরাজ কলুপুত্র! কাঙ্গালের পেট ভরে নাই। তখন কলুর ছেলে তাহার পানে চাহিয়া দেখিল। আর মাছ নাই-এক মুষ্টি ভাত কুকুরকে ফেলিয়া দিল। পুরন্দর যে সুখে নন্দনকাননে বসিয়া সুধা পান করেন, কার্ডিনেল উল্সি বা কার্ডিনেল জেরেজ যে সুখে কার্ডিনেলের টুপি পরিয়াছিলেন, কুক্কুর সেই সুখে সেই অন্নমুষ্টি ভোজন করিতে লাগিল। এমত সময়ে, কলুগৃহিণী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। ছেলের কাছে একটা কুকুর ম্যাক্ ম্যাক্ করিয়া ভাত খাইতেছে-দেখিয়া কলুপত্নী রোষ-কষায়িত-লোচনে এক ইষ্টকখণ্ড হইয়া কুক্কুর প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাজনীতিজ্ঞ তখন আহত হইয়া, লাঙ্গুলসংগ্রহপূর্ব্বক বহুবিধ রাগ রাগিণী আলাপচারী করিতে করিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিল।

এই অবসরে আর একটি ঘটনা দৃষ্টিগোচর হইল। যতক্ষণ ক্ষীণজীবী কুক্কুর আপন উদরপূর্ত্তির জন্য বহুবার কৌশল করিতেছিল, ততক্ষণ এক বৃহৎকায় বৃষ আসিয়া কলুর বলদের সেই খোলবিচালি-পরিপূর্ণ নাদায় মুখ দিয়া জাবনা খাইতেছিল-বলদ বৃষের ভীষণ শৃঙ্গ এবং স্থূলকায় দেখিয়া, মুখ সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কাতরনয়নে তাহার আহারনৈপুণ্য দেখিতেছিল। কুক্কুরকে দূরীকৃত করিয়া, কলুগৃহিণী এই দস্যুতা দেখিতে পাইয়া এক বংশখণ্ড লইয়া বৃষকে গোভাগাড়ে যাইবার পরামর্শ দিতে দিতে তৎপ্রতি ধাবমানা হইলেন। কিন্তু ভাগাড়ে যাওয়া দূরে থাকুক-বৃষ এক পদও সরিল না-

এবং কুলগৃহিণী নিকটবর্ত্তিনী হইলে বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া, তাঁহার হৃদয়মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। কলুপত্নী তখন রণে ভঙ্গ দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃষ অবকাশমতে নাদা নিঃশেষ করিয়া হেলিতে দুলিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

আমি ভাবিলাম যে, এও পলিটিক্স্। দুই রকমের পলিটিক্স্ দেখিলাম–এক কুক্কুর জাতীয়, আর এক বৃষজাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন–আর উল্সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্য্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশান।

০৩. বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব

মহাশয়! আপনাকে পত্র লিখিব কি-লিখিবার অনেক অনেক শত্রু। আমি এখন যে কুঁড়ে ঘরে বাস করি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার পাশে গোটা দুই তিন ফুলগাছ পুঁতিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম, কমলাকান্তের কেহ নাই-এই ফুলগুলি আমার সখা সখী হইবে। খোশামোদ করিয়া ইহাদের ফুটাইতে হইবে না-টাকা ছড়াইতে হইবে না, গহনা দিতে হইবে না, মনযোগান গোছ কথা বলিতে হইবে না, আপনার সুখে উহারা আপনি ফুটিবে। উহাদের হাসি আছে-কান্না নাই; আমোদ আছে-রাগ নাই। মনে করিলাম, যদি প্রসন্ন গোয়ালিনী আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, তবে এই ফুলের সঙ্গে প্রণয় করিব।

তা, ফুল ফুটিল-তারা হাসিল। মনে করিলাম-মহাশয় গো! কিছু মনে করিতে না করিতে, ফুটন্ত ফুল দেখিয়া ভোমরার দল,-লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে, ভোমরা বোল্‌তা মৌমাছি-বহুবিধ রসক্ষেপা রসিকের দল, আসিয়া আমার দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন গুন্ গুন্ ভন্ ভন্ ঝন্ ঝন্ ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া হাড় জ্বালাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম যে, হে মহাশয়গণ! এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লীগ, সোসাইটি, ক্লব প্রভৃতি কিছুই নহে-কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন-আমি কোন রিজলিউশ্যনই দ্বিতীয়ত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন। গুন্ গুনের দল, তাহাতে কোন মতে সম্মত নহে-বরং ফুলগাছ ছাড়িয়া আমার কুটীরের ভিতর হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই মাত্র আপনাকে এক পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছিলাম-(আফিঙ্গ ফুরাইয়াছে)-এমত সময়ে এক ভ্রমর কুচকুচে কালো আসল বৃন্দাবনী কালাচাঁদ, ভোঁ করিয়া ঘরের ভিতর উড়িয়া আসিয়া কাণের কাছে ঘ্যানঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন-লিখিব কি, মহাশয়?

ভ্রমর বাবাজি নিশ্চিত মনে করেন, তিনি বড় সুরসিক-বড় সদ্বক্তা-তাঁহার ঘ্যানঘ্যানানিতে আমার সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া যাইবে। আমারই ফুলগাছের ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া আসিয়া আমারই কাণের কাছে ঘ্যানঘ্যান্? আমার রাগ অসহ্য হইয়া উঠিল; আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল। আমি কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী-দপ্তর মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায় মনুষ্যবীর্য্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষে আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর! তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবার ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে! আমি যত পাখা ঘুরাইয়া বায়ূ সৃষ্টি করিয়া ভ্রমরকে উড়াইতে লাগিলাম, ততই সে দুরাত্মা ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমার মাথামুণ্ড বেড়িয়া চোঁ বোঁ করিতে লাগিল। কখনও সে আমার বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, মেঘের আড়াল হইতে ইন্দ্রজিতের ন্যায় রণ করিতে লাগিল, কখনও কুম্ভকর্ণনিপাতী রামসৈন্যের ন্যায় আমার বগলের নীচে দিয়া ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল; কখনও স্যাম্পসনের ন্যায় শিরোরুহমধ্যে আমার বীর্য্য সংন্যস্ত মনে করিয়া, আমার শরন্নীরদনিন্দিত কুঞ্চিত শ্বেতকৃষ্ণ কেশদামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভেরী বাজাইতে লাগিল। তখন দংশনভয়ে অস্থির হইয়া রণে ভঙ্গ দিলাম। ভ্রমর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল। সেই সময়ে চৌকাঠ পায়ে বাধিয়া কমলাকান্ত- "পপাত ধরণীতলে !!!" এই সংসার সমরে মহারথী শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী-যিনি দারিদ্র্য, চিরকৌমার এবং অহিফেন

প্রভৃতির দ্বারাও কখন পরাজিত হয়েন নাই-হায়! তিনি এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলেন। তখন ধূল্যবলুণ্ঠিত শরীরে দ্বিরেফরাজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম "হে দ্বিরেফসত্তম! কোন্ অপরাধে দুঃখী ব্রাহ্মণ তোমার নিকট অপরাধী যে, তুমি তাহার লেখা পড়ার ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ? দেখ, আমি এই বঙ্গদর্শনে পত্র লিখিতে বসিয়াছি-পত্র লিখিলে আফিঙ্গ আসিবে-তুমি কেন ঘ্যানঘ্যান্ করিয়া তাহার বিঘ্ন কর?" আমি প্রাতে একখানি বাঙ্গালা নাটক পড়িতেছিলাম-তখন অকস্মাৎ সেই নাটকীয় রাগগ্রস্ত হইয়া বলিতে লাগিলাম- "হে ভৃঙ্গ! হে অনঙ্গরঙ্গতরঙ্গবিক্ষে-পকারিন্! হে দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডভণ্ডচিত্তলণ্ডভণ্ড-করিন! হে উদ্যানবিহারিন্-কেন তুমি ঘ্যানঘ্যান্ করিতেছ? হে ভৃঙ্গ! হে দ্বিরেফ! হে ষটপদ! হে অলে! হে ভ্রমর! হে ভোমরা! হে ভোঁ ভোঁ-
ভ্রমর ঝুপ করিয়া আসিয়া সামনে বসিল। তখন গুণ্ গুণ্ করিয়া গলা দুরস্ত করিয়া বলিতে লাগিল-আমি অহিফেনপ্রসাদে সকলেরই কথা বুঝিতে পারি-আমি স্থিরচিত্তে শুনিতে লাগিলাম।
ভৃঙ্গরাজ বলিতে লাগিলেন, "হে বিপ্র! আমারি উপর এত চোট কেন? আমি কি একাই ঘ্যানঘেনে! তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যানঘ্যান্ করিব না ত কি করিব? বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালির ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি ঙ হইলেন, তিনি গিয়া বেল্-ভিডিয়রে ঘ্যানঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রিদিবা রাজদ্বারে ঘ্যানঘ্যান্ করেন। যিনি কেবল একটি চাকরির উমেদওয়ার-তাঁর ঘ্যানঘ্যানানির ত আর অন্ত নাই। বাঙ্গালি বাবু যিনিই দুই চারিটা ইংরেজি বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যানঘ্যান্-ডাঁশমাছির মত খাবার সময়ে, শোবার সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে, দিনে, রাত্রে, প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে-ঘ্যান্ ঘ্যান্ ঘ্যান্! যিনি উমেদওয়ারি স্বাধীন হইয়া উকীল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যানঘেনে। সত্যমিথ্যার সাগরসঙ্গমে প্রাতঃস্নান করিয়া উঠিয়া, যেখানে দেখেন, কাঠগড়ার ভিতর বিড়ে মাথায় সরকারি জুজু বসিয়া আছে-বড় জজ, ছোট জজ, সবজজ, ডিপুটি, মুন্সেফ-সেইখানে গিয়া সেই পেশাদার ঘ্যানঘ্যানে, ঘ্যানঘ্যানানির ফোয়ারা খুলিয়া দেন। কেহ বা মনে করেন, ঘ্যানঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন-সভাতলে ছেলে বুড়ো জমা করিয়া ঘ্যানঘ্যান্ করিতে থাকেন। কোন্ দেশে বৃষ্টি হয় নাই-এসো বাপু ঘ্যানঘ্যান্ করি; বড় চাকরি পাই না-এসো বাপু ঘ্যানঘ্যান্ করি-রমাকান্তের মা মরিয়াছে-এসো বাপু স্মরণার্থ ঘ্যানঘ্যান্ করি। কাহারও বা তাতেও মন উঠে না-তাঁরা কাগজ কলম লইয়া, হপ্তায় হপ্তায়, মাসে মাসে, দিন দিন ঘ্যানঘ্যান্ করেন; আর তুমি যে বাপু আমার ঘ্যানঘ্যানানিতে এত রাগ করিতেছ, তুমিও ও কি করিতে বসিয়াছ? বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের কাছে কিছু আফিঙ্গের যোগাড় করিবে বলিয়া ঘ্যানঘ্যান্ করিতে বসিয়াছ? আমার চোঁ বোঁই কি এত কটু?
"তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যানঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যানঘ্যান্ করি না-মধু সংগ্রহ করি, আর হুল ফুটাই। তোমরা না জান শুধু মধু সংগ্রহ করিতে না জান হুল ফুটাইতে-কেবল ঘ্যানঘ্যান্ পার। একটা কাজের সঙ্গে খোঁজ নাই-কেবল কাঁদুনে মেয়ের মত দিবারাত্রি ঘ্যানঘ্যান্। একটু বকাবকি লেখালেখি কম করিয়া কিছু কাজে মন দাও-তোমাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মধু করিতে শেখ-হুল ফুটাইতে শেখ। তোমাদের রসনা অপেক্ষা আমাদের হুল শ্রেষ্ঠ-বাক্যবাণে মানুষ মরে না; আমাদের হুলের ভয়ে জীবলোক সদা

সশঙ্কিত! স্বর্গে ইন্দ্রের বজ্র, মর্ত্ত্যে ইংরেজদের কামান, আকাশমার্গে আমাদের হুল! সে যাক, মধু কর; কাজে মন দাও। নিতান্ত যদি দেখ, রসনাকণ্ডুয়ন রোগ জন্য কাজে মন যায় না-জিবে কাষ্ঠকি দিয়া ঘা কর-অগত্যা কাজে মন যাইতে পারে। আর শুধু ঘ্যানঘ্যান্ ভাল লাগে না।"

এই বলিয়া ভ্রমররাজ ভোঁ করিয়া উড়িয়া গেল।

আমি ভাবিলাম যে, এই ভ্রমর অবশ্য বিশেষ বিজ্ঞ পতঙ্গ। শুনা আছে, মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইলেই সে বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্য দ্বিপদ মনুষ্য হইতে চতুষ্পদ পশু-পক্ষান্তরে যে সকল মনুষ্যের পদবৃদ্ধি হইয়াছে-তাহারা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া গণ্য। এই ষট্পদের-একখানি না, দুখানি না-ছয় ছয়খানি পা! অবশ্য এ ব্যক্তি বিশেষ বিজ্ঞ হইবে-ইহার অসামান্য পদবৃদ্ধি দেখা যায়। এই বিজ্ঞ পতঙ্গের পরামর্শ অবহেলন করি কি প্রকারে? অতএব আপাততঃ ঘ্যানঘ্যানানি বন্ধ করিলাম-কিন্তু মধুসংগ্রহের আশাটা রহিল। বঙ্গদর্শন পুষ্প হইতে অহিফেন মধু সংগ্রহ হইবে এই ভরসায় প্রাণ ধারণ করে-

আপনার আজ্ঞাবহ
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

০৪. বুড়া বয়সের কথা

সম্পাদক মহাশয়! আফিঙ্গ পৌঁছে নাই, বড় কষ্ট গিয়াছে। আজ যাহা লিখিলাম, তাহা বিস্ফারিত লোচনে লেখা। নিজ বুদ্ধিতে, অহিফেন প্রসাদাৎ নহে। একটা মনের দুঃখের কথা লিখিব।
বুড়া বয়সের কথা লিখিব! লিখি লিখি মনে করিতেছি, কিন্তু লিখিতে পারিতেছি না। হইতে পারে যে, এই নিদারুণ কথা আমার কাছে বড় প্রিয়,-আপনার মর্ম্মান্তিক দুঃখের পরিচয় আপনার কাছে বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু আমি লিখিলে পড়িবে কে? যে যুবা, কেবল সেই পড়ে; বুড়ায় কিছু পড়ে না। বোধ হয়, আমার এই বুড়া বয়সের কথার পাঠক জুটিবে না।
অতএব আমি ঠিক বুড়া বয়সের কথা লিখিব না। বলিতে পারি না; বৈতরণীর তরঙ্গাভিহত জীবনের সেই শেষ সোপানে আজিও পদার্পণ করি নাই; আজিও আমার পারের কড়ি সংগ্রহ করা হয় নাই। আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, সে দিন আজিও আসে নাই। তবে যৌবনেও আমার আর দাবি দাওয়া নাই; মিয়াদি পাট্টার মিয়াদ ফুরাইয়াছে। এক দিকে মিয়াদ অতীত হইল, কিন্তু বাকি বকেয়া আদায় উসুল করা হয় নাই, তাহার জন্য কিছু পীড়াপীড়ি আছে; যৌবনের আখিরি করিয়া ফারখতি লইতে পারি নাই। তাহার উপর মহাজনেরও কিছু ধারি; অনাবৃষ্টির দিনে অনেক ধার করিয়া খাইয়াছিলাম, শোধ দিতে পারি এমত সাধ্য নাই। তার উপর পাটনির কড়ি সংগ্রহ করিবার সময় আসিল। আমার এমন দুঃখের সময়ের দুটো কথা বলিব, তোমরা যৌবনের সুখ ছাড়িয়া কি একবার শুনিবে না?
আগে আসল কথাটা মীমাংসা করা যাউক-আমি কি বুড়া? আমি আমার নিজের কথাই বলিতেছি এমত নহে, আমি বুড়া, না হয় যুবা, দুইয়ের এক স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু যাঁহারই বয়সটা একটু দোটানা রকম-যাঁরই ছায়া পূর্ব্বদিকে হেলিয়াছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, মীমাংসা করুন দেখি, আপনি কি বুড়া। আপনার কেশগুলি, হয়ত আজিও অনিন্দ্য ভ্রমরকৃষ্ণ, হয়ত আজিও দন্তসকল অবিচ্ছিন্ন মুক্তামালার লজ্জাস্থল, হয়ত আপনার নিদ্রা অদ্যাপি এমন প্রগাঢ় যে, দ্বিতীয় পক্ষের ভার্য্যাও তাহা ভাঙ্গিতে পারে না;-তথাপি, হয়ত আপনি প্রাচীন। নয়ত, আপনার কেশগুলি শাদা কালোয় গঙ্গা যমুনা হইয়া গিয়াছে, দশন মুক্তাপাতি ছিঁড়িয়া গিয়াছে, দুই একটি মুক্তা হারাইয়া গিয়াছে-নিদ্রা, চক্ষুর প্রতারণামাত্র, তথাপি আপনি যুবা। তুমি বলিবে ইহার অর্থ, "বয়সেতে বিজ্ঞ নহে, বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।" তাহা নহে-আমি বিজ্ঞতার কথা বলিতেছি না, প্রাচীনতার কথা বলিতেছি। প্রাচীনতা বয়সেই ফল, আর কিছুরই নহে। ধাতুবিশেষে কিছু তারতম্য হয়, কেহ চল্লিশে বুড়া, কেহ বিয়াল্লিশে যুবা। কিন্তু তুমি কখন দেখিবে না যে, বয়সের অধিক তারতম্য ঘটে। যে পঁয়তাল্লিশে যুবা বলাইতে চায়, সে হয় যম-ভয়ে নিতান্ত ভীত, নয় তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছে; সে পঁয়ত্রিশে বড়াই বলাইতে চায়, সে হয় বুড়াই ভালবাসে, নয় পীড়িত, নয় কোন বড় দুঃখে দুঃখী।
কিন্তু এই অর্দ্ধেক পথ অতিবাহিত করিয়া, প্রথম চসমাখানি হাতে করিয়া রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে ঠিক বলা দায় যে আমি বুড়া হইয়াছি কি না! বুঝি বা হইয়াছি। বুঝি হই নাই। মনে মনে ভরসা আছে, একটু চক্ষুর দোষ হউক, দুই এক গাছা চুল পাকুক, আজিও প্রাচীন হই নাই। কই, কিছু ত প্রাচীন হয় নাই! এই চিরপ্রাচীন ভুবনমণ্ডল ত আজিও নবীন; আমার প্রিয় কোকিলের স্বর প্রাচীন হয় নাই; আমার সৌন্দর্য্য-মাখা, হীরা বসান, গঙ্গার ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ ত প্রাচীন হয় নাই; প্রভাতের বায়ু বকুল কামিনীর গন্ধ, বৃক্ষের শ্যামলতা, এবং নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা, কেহ ত প্রাচীন হয় নাই-তেমনই

সুন্দর আছে। আমি কেবল প্রাচীন হইলাম? আমি এ কথায় বিশ্বাস করিব না। পৃথিবীতে উচ্চ হাসি ত আজিও আছে, কেবল আমার হাসির দিন গেল? পৃথিবীতে উৎসাহ, ক্রীড়া, রঙ্গ, আজিও তেমনি অপর্য্যাপ্ত, কেবল আমারই পক্ষে নাই? জগৎ আলোকময়, কেবল আমারই রাত্রি আসিয়াছে? সলমন কোম্পানির দোকানে বজ্রাঘাত হউক, আমি এ চস্‌মা ভাঙ্গিয়া ফেলিব, আমি বুড়া বয়স স্বীকার করিব না।

তবু আসে-ছাড়ান যায় না। ধীরে ধীরে দিনে দিনে পলে পলে বয়শ্চোর আসিয়া, এ দেহপুরে প্রবেশ করিতেছে-আমি যাহা মনে ভাবি না কেন, আমি বুড়া, প্রতি নিশ্বাসে তাহা জানিতে পারিতেছি। অন্যে হাসে, আমি কেবল ঠোঁট হেলাইয়া তাহাদিগের মন রাখি। অন্যে কাঁদে, আমি কেবল লোকলজ্জায় মুখ ভার করিয়া থাকি-ভাবি, ইহারা এ বৃথা কালহরণ করিতেছে কেন? উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম-আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই, আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই! কই-দূর হউক, যাহা নাই তাহা আর খুঁজিয়া কাজ নাই।

খুঁজিয়া দেখিব কি? যে কুসুমদাম এ জীবনকানন আলো করিত, পথিপার্শ্বে একে একে তাহা খসিয়া পড়িয়াছে। যে মুখমণ্ডলসকল ভালবাসিতাম, একে একে অদৃশ্য হইয়াছে, না হয় রৌদ্রবিশুষ্ক বৈকালের ফুলের মত শুকাইয়া উঠিয়াছে। কই, আর এ ভগ্নমন্দিরে, এ পরিত্যক্ত নাট্যশালায়, এ ভাঙ্গা মজলিসে সে উজ্জ্বল দীপাবলী কই? একে একে নিবিয়া যাইতেছে। কেবল মুখ নহে-হৃদয়। সে সরল, সে ভালবাসাপরিপূর্ণ, সে বিশ্বাসে দৃঢ়, সৌহার্দ্যে স্থির, অপরাধেও প্রসন্ন, সে বন্ধুহৃদয় কই? নাই। কার দোষে নাই? আমার দোষে নহে। বন্ধুর দোষে নহে। বয়সের দোষে অথবা যমের দোষে।

তাতে ক্ষতি কি? একা আসিয়াছি, একা যাইব-তাহার ভাবনা কি? এ লোকালয়ের সঙ্গে আমার বনিয়া উঠিল না-আচ্ছা-রোখশোধ। পৃথিবী! তুমি তোমার নিয়মিত পথে আবর্ত্তন করিতে থাক, আমি আমার অভীষ্ট স্থানে গমন করি-তোমায় আমায় সম্বন্ধ রহিত হইল-তাহাতে, হে মৃন্ময়ি জড়পিণ্ডগৌরব-পীড়িতে বসুন্ধরে! তোমারই বা ক্ষতি কি, আমারই বা ক্ষতি কি? তুমি অনন্তকাল শূন্যপথে ঘুরিবে, আমি আর অল্প দিন ঘুরিব মাত্র। পরে তোমার কপালে ছাইগুলি দিয়া, যাঁর কাছে সকল জ্বালা জুড়ায়, তাঁর কাছে গিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব!

তবে, স্থির হইল এক প্রকার যে, বুড়া বয়সে পড়িয়াছি। এখন কর্ত্তব্য কি? "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ?"এ কোন গণ্ডমূর্খের কথা। আবার বন কোথা? এ বয়সে, এই অট্টালিকাময়ী লোকপূর্ণা আপণসমাকুলা নগরীই বন। কেন না, হে বর্ষীয়ান্ পাঠক! তোমার আমার সঙ্গে আর ইহার মধ্যে কাহারও সহৃদয়তা নাই। বিপদকালে কেহ কেহ আসিয়া বলিতে পারি যে, "বুড়া! তুমি অনেক দেখিয়াছ, এ বিপদে কি করিব বলিয়া দাও,__" কিন্তু, সম্পদকালে কেহই বলিবে না, "বুড়া! আজি আমার আনন্দের দিন, তুমি আসিয়া আমাদিগের উৎসব বৃদ্ধি কর! " বরং আমোদ-আহ্লাদ কালে বলিবে, "দেখ ভাই, যেন বুড়া বেটা জানিতে না পারে।" তবে আর অরণ্যের বাকি কি?

যেখানে আগে ভালবাসার প্রত্যাশা করিতে, এখন সেখানে তুমি কেবল ভয় বা ভক্তির পাত্র। যে পুত্র তোমার যৌবনকালে, তাহার শৈশবকালে, তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াও অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থাতেই, ক্ষুদ্র হস্ত প্রসারণ করিয়া, তোমার অনুসন্ধান করিত, সে এখন লোকমুখে সম্বাদ লয়, পিতা কেমন আছেন। পরের ছেলে, সুন্দর দেখিয়া যাহাকে কোলে তুলিয়া, তুমি আদর করিয়াছিলে, সে এখন কালক্রমে, বয়ঃপ্রাপ্ত, কর্কশকান্তি, হয়ত মহাপাপিষ্ঠ, পৃথিবীর পাপস্রোত বাড়াইতেছে, হয়ত, তোমারই

দ্বেষক–তুমি কেবল কাঁদিয়া বলিতে পার, “ইহাকে আমি কোলে পিঠে করিয়াছি।” তুমি যাহাকে কোলে বসাইয়া ক,খ শিখাইয়াছিলে, সে হয়ত এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত, তোমার মূর্খতা দেখিয়া মনে মনে উপহাস করে। যাহারই স্কুলের বেতন দিয়া তুমি মানুষ করিয়াছিলে, সে হয়ত এখন তোমাকে টাকা ধার দিয়া, তোমারই কাছে সুদ খায়। তুমি যাহাকে শিখাইতে, হয়ত সে তোমায় শিখাইতেছে। যে তোমার অগ্রাহ্য ছিল, তুমি আজি তার অগ্রাহ্য। আর অরণ্যের বাকি কি?

অন্তর্জগত ছাড়িয়া বহির্জগতেও এইরূপ দেখিবে। যেখানে তুমি স্বহস্তে পুষ্পোদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছিলে–বাছিয়া বাছিয়া গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া, বিগ্নোনিয়া, সাইপ্রেস, অরকেরিয়া আনিয়া পুঁতিয়াছিলে, পাত্রহস্তে স্বয়ং জলসিঞ্চন করিয়াছিলে, সেখানে দেখিবে, ছোলা মটরের চাষ,-হারাধন পোদ গামছা কাঁধে, মোটা মোটা বলদ লইয়া, নির্ব্বিঘ্নে লাঙ্গল দিতেছে–সে লাঙ্গলের ফাল তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। যে অট্টালিকা তুমি যৌবনে, অনেক সাধ মনে মনে রাখিয়া অনেক সাধ পুরাইয়া যত্নে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, যাহাতে পালঙ্ক পাড়িয়া নয়নে নয়নে অধরে অধরে মিলাইয়া ইহ–জীবনের অনশ্বর প্রণয়ের প্রথম পবিত্র সম্ভাষণ করিয়াছিলে হয়ত দেখিবে, সে গৃহের ইষ্টকসকল দামু ঘোষের আস্তাবলের সুর্‌কির জন্য চূর্ণ হইতেছে; সে পালঙ্কের ভগ্নাংশ লইয়া কৈলাসীর মা পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিতেছে–আর অরণ্যের বাকি কি? সকল জ্বালার উপর জ্বালা, সেই যৌবনে যাহাকে সুন্দর দেখিয়াছিলাম–এখন সে কুৎসিত। আমার প্রিয়বন্ধু দাসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীতকন্ঠ কপোতের ন্যায় সগর্ব্বে বেড়াইত–কত মাগী গঙ্গার ঘাটে, স্নানকালে তাহাকে দেখিয়া নমঃ শিবায় নমঃ বলিয়া ফুল দিত, “দাসু মিত্রায় নমঃ” বলিয়া ফুল দিয়াছে। এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ককন্ঠ, পলিত–কেশ, দন্তহীন, লোলচর্ম্ম, শীর্ণকায়। দাসুর একটা ব্রাণ্ডি আর তিনটা মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল,- এখন দাসু নামাবলীর ভয়ে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া ফেলে। আর অরণ্যের বাকি কি? গদার মাকে দেখ। যখন আমার সেই পুষ্পোদ্যানে, তরঙ্গিণী নামে যুবতী ফুল চুরি করিতে যাইত, মনে হইত, নন্দনকানন হইতে সচল সপুষ্প পারিজাত বৃক্ষ আনিয়া কে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার অলকদাম লইয়া উদ্যান–বায়ু ক্রীড়া করিত, তাহার অঞ্চলে কাঁটা বিঁধিয়া দিয়া, গোলাপ গাছ রসকেলি করিত। আর আজি গদার মাকে দেখ। বকাবকি করিতে করিতে চাল ঝাড়িতেছে–মলিনবসনা, বিকটদশনা, তীব্ররসনা–দীর্ঘাঙ্গী, কৃষ্ণাঙ্গী, কৃশাঙ্গী, লোলচর্ম্মা, পলিতকেশ, শুষ্কবাহু, কর্কশ–কন্ঠ। এই সেই তরঙ্গিণী–আর অরণ্যের বাকি কি?

তবে স্থির বনে যাওয়া হবে না। তবে কি করিব? হিন্দুশাস্ত্রর বশবর্ত্তী হইয়া কালিদাসও সর্ব্বগুণবান্ রঘুগণের বার্দ্ধক্যের মুনিবৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি–কালিদাস চল্লিশ পার হইয়া রঘুবংশ লিখেন নাই। তিনি যে রঘুবংশ যৌবনে লিখিয়াছিলেন, এবং কুমারসম্ভব চল্লিশ পার করিয়া লিখিয়াছিলেন, তাহা আমি দুইটি কবিতা উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছি–

প্রথম অজবিলাপে,

“ইদমুচ্ছ্বসিতালকং মুখং
তব বিশ্রান্তকথং দুনোতি মাম্।
নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং
বিরতাভ্যন্তরষট্ পদস্বনম্।।”18

এটি যৌবনের কান্না।-
তারপর রতিবিলাপে,

"গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিসহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্।।"19

এটি বুড়া বয়সের কান্না।-
তা যাই হউক, কালিদাস বুড়া বয়সের গৌরব বুঝিলেও কখন বৃদ্ধের কপালে মুনিবৃত্তি লিখিতেন না। বিস্মার্ক, মোলটকে ও ফ্রেডেরিক বুড়া; তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে-জর্ম্মান ঐকজাত্য কোথা থাকিত? টিয়র প্রাচীন-টিয়র মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে ফ্রান্সের স্বাধীনতা এবং সাধারণতন্ত্রাবলম্বন কোথা থাকিত? গ্লাডষ্টোন এবং ডিশ্রেলি বুড়া-তাঁহারা মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিলে পার্লিয়ামেন্টের রিফর্ম এবং আয়রিশ্ চর্চ্চের ডিসেষ্টাব্লিশমেন্ট কোথা থাকিত?
প্রাচীন বয়সই বিষয়ৈষার সময়। আমি অন্ত্র-দন্তহীন ত্রিকালের বুড়ার কথা বলিতেছি না-তাঁহারা দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত। যাঁহারা আর যুবা নাই বলিয়াই বুড়া, আমি তাঁহাদিগের কথা বলিতেছি। যৌবন কর্ম্মের সময় বটে, কিন্তু তখন কাজ ভাল হয় না। একে বুদ্ধি অপরিপক্ক, তাহাতে আবার রাগ দ্বেষ ভোগাসক্তি, এবং স্ত্রীগণের অনুসন্ধানে তাহা সতত হীনপ্রভ; এজন্য মনুষ্য যৌবন সচরাচর সেই কার্য্যক্ষম হয় না। যৌবন অতীতে মনুষ্য বহুদর্শী, স্থিরবুদ্ধি, লব্ধপ্রতিষ্ঠ, এবং ভোগাসক্তির অনধীন, এজন্য সেই কার্য্যকারিতার সময়। এই জন্য, আমার পরামর্শ যে, বুড়া হইয়াছি বলিয়া, কেহ স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মুনিবৃত্তির ভান করিবে না। বার্দ্ধক্যেও বিষয়চিন্তা করিবে।
তোমরা বলিবে, এ কথা বলিতে হইবে না; কেহই জীবন থাকিতে ও শক্তি থাকিতে বিষয়-চেষ্টা পরিত্যাগ করে না। মাতৃস্তনপান অবধি উইল করা পর্য্যন্ত আবালবৃদ্ধ কেবল বিষয়ান্বেষণে বিব্রত। সত্য, কিন্তু আমি সেরূপ বিষয়ানুসন্ধানে বৃদ্ধকে নিযুক্ত করিতে চাহিতেছি না। যৌবনে যে কাজ করিয়াছি, সে আপনার জন্য; তার পর যৌবন গেলে যত কাজ করিবে, পরের জন্য। ইহাই আমার পরামর্শ। ভাবিও না যে, আজিও আপনার কাজ করিয়া উঠিতে পারিলাম না-পরের কাজ করিব কি? আপনার কাজ ফুরায় না-যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত-তবু আপনার কাজ ফুরাইত না-মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই-অন্ত নাই। তাই বলি, বার্দ্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে, বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও। এই মুনিবৃত্তি যথার্থ মুনিবৃত্তি। এই মুনিবৃত্তি অবলম্বন কর।
যদি বল, বার্দ্ধক্যেও যদি আপনার জন্য হউক, বিষয়-কার্য্যে নিরত থাকিব, তবে ঈশ্বরচিন্তা করিব কবে?- পরকালের কাজ করিব কবে? আমি বলি, আশৈশব পরকালের কাজ করিবে, শৈশব হইতে জগদীশ্বরকে হৃদয়ে প্রধান স্থান দিবে। যে কাজ সকল কাজের উপর কাজ, তাহা প্রাচীন কালের জন্য তুলিয়া রাখিবে কেন? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে, বার্দ্ধক্যে, সকল সময়েই ঈশ্বরকে ডাকিবে। ইহার জন্য বিশেষ অবসরের প্রয়োজন নাই-ইহার জন্য অন্য কোন কার্য্যের ক্ষতি নাই। বরং দেখিবে, ঈশ্বরভক্তির সঙ্গে মিলিত হইলে সকল কার্য্যই মঙ্গলপ্রদ, যশস্কর এবং পরিশুদ্ধ হয়।
আমি বুঝিতে পারিতেছি, অনেকের এ সকল কথা ভাল লাগিতেছে না। ইঁহারা এতক্ষণ বলিতেছেন, তরঙ্গিণী যুবতীর কথা হইতেছিল-হইতে হইতে আবার ঈশ্বরের নাম কেন? এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাতিয়া, বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে-আবার এ শিবের গীত কেন? দোষ হইতেছে স্বীকার

করি, কিন্তু মনে মনে বোধ হয়, সকল কাজেই একটু একটু শিবের গীত ভাল।
ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের অন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিণী হেমাঙ্গিণী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণী দল আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোমত, সেপন্সর, ফূয়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার–সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দ্দিনে–আজি এ কালরাত্রির শেষ কুলগ্নে,-এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে,-আমায় আর কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখরবাহিনী বৈতরিণীর আবর্ত্ত–ভীষণ উপকূলে–এ দুস্তর পারাবারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতি বেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে–অন্ধকার, প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্র ভেলা দুষ্কৃতের ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?

—————————-

18 বায়ূবশে অলকাগুলিন চালিত হইতেছে–অথচ বাক্যহীন তোমার এই মুখ রাত্রিকালে প্রমুদিত, সুতরাং অভ্যন্তরে ভ্রমর–গুঞ্জন–রহিত একটি পদ্মের ন্যায় আমাকে ব্যথিত করিতেছে।
19 তোমার সেই সখা বায়ূতাড়িত দীপের ন্যায় পরলোকে গমন করিয়াছেন, আর ফিরিবেন না। আমি নির্ব্বাপিত দীপের দশাবৎ অসহ্য দুঃখে ধূমিত হইতেছি দেখ।

০৫. কমলাকান্তের বিদায়

সম্পাদক মহাশয়!

বিদায় হইলাম, আর লিখিব না। বনিল না। আপনার সঙ্গে বনিল না, পাঠকের সঙ্গে বনিল না, এ সংসারের সঙ্গে আমার বনিল না। আপনার সঙ্গে আর আমার বনিল না। আর কি লেখা হয়? বেসুরে কি এ বাঁশি বাজে? বাঁশী বাজি বাজি করে, তবু বাজে না-বাঁশী ফাটিয়াছে। আবার বাজ দেখি, হৃদয়ের বংশী! হায়! তুই কি আর তেমনি করিয়া বাজিতে জানিস্? আর কি সে তান মনে আছে? না, তুই সেই আছিস-না আমি সেই আমি আছি, তুই ঘুনে ধরা বাঁশী-আমি ঘুনে ধরা কি, কি ছাই তা আমি জানি না। আমার সে স্বর নাই-আর বাজাইব কি? আর সে রস নাই, শুনিবে কে? একবার বাজ দেখি, হৃদয়! এই জগৎ সংসারে-বধির, অর্থচিন্তায় বিব্রত, মূঢ় জগৎ সংসারে, সেইরূপ আমার মনের লুকান কথাগুলি তেমনি করিয়া বল্ দেখি? বলিলে কেহ শুনিবে কি? তখন বয়স ছিল-কত কাল হইল সে দপ্তর লিখিয়াছিলাম-এখন সে বয়স, সে রস নাই-এখন সে রস ছাড়া কথা কেহ শুনিবে কি? আর সে বসন্ত নাই-এখন গলা-ভাঙ্গা কোকিলের কুহুরব কেহ শুনিবে কি?

ভাই, আর কথায় কাজ নাই-আর বাজিয়া কাজ নাই-ভাঙ্গা বাঁশের মোটা আওয়াজে আর কুক্কুর-রাগিণী ভাঁজিয়া কাজ নাই। এখন হাসিলে কেহ হাসিবে না-কাঁদিলে বরং লোকে হাসিবে। প্রথম বয়সের হাসিকান্নায় সুখ আছে-লোকে সঙ্গে সঙ্গে হাসে কাঁদে;-এখন হাসিকান্না। ছি!-কেবল লোক হাসান!

হে সম্পাদককুলশ্রেষ্ঠ! আপনাকে স্বরূপ বলিতেছি-কমলাকান্তের আর সে রস নাই। আমার সে নসী বাবু নাই-অহিফেনের অনটন-সে প্রসন্ন কোথায় জানি না-তাহার সে মঙ্গলা গাভী কোথায় জানি না। সত্য বটে, আমি তখনও একা-এখনও একা- কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র-এখন আমি একায় আধখানা। কিন্তু একার এত বন্ধন কেন? যে পাখীটি পুষিয়াছিলাম-কবে মরিয়া গিয়াছে-তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে ফুলটি ফুটাইয়াছিলাম-কবে শুকাইয়াছে, তাহার জন্য আজিও কাঁদি; যে জলবিম্ব, একবার জলস্রোতে সূর্য্যরশ্মি সম্প্রভাত দেখিয়াছিলাম-তাহার জন্য আজিও কাঁদি। কমলাকান্ত অন্তরে অন্তরের সন্ন্যাসী-তাহার এত বন্ধন কেন? এ দেহ পচিয়া উঠিল-ছাই ভস্ম মনের বাঁধনগুলো পচে না কেন? ঘর পুড়িয়া গেল-আগুন নিভে না কেন? পুকুর শুকাইয়া আসিল-এ পঙ্কে পঙ্কজ ফুটে না কেন? ঝড় থামিয়াছে-দরিয়ায় তুফান কেন? ফুল শুকাইয়াছে-এখনও-গন্ধ কেন? সুখ গিয়াছে-আশা কেন? স্মৃতি কেন? জীবন কেন? ভালবাসা গিয়াছে-যত্ন কেন? প্রাণ গিয়াছে-পিণ্ডদান কেন? কমলাকান্ত গিয়াছে-যে কমলাকান্ত চাঁদ বিবাহ করিত, কোকিলের সঙ্গে গায়িত, ফুলের বিবাহ দিত, এখন আবার তার আফিঙ্গের বরাদ্দ কেন? বাঁশী ফাটিয়াছে-আবার সা, ঋ, গ, ম কেন? প্রাণ গিয়াছে, ভাই, আর নিশ্বাস কেন? সুখ গিয়াছে, ভাই, আর কান্না কেন?

তবু কাঁদি। জন্মিবা মাত্র কাঁদিয়াছিলাম, কাঁদিয়া মরিব। এখন কাঁদিব, লিখিব না।

অনুগত, স্বগত এবং বিগত
শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী

কমলাকান্তের জোবানবন্দী

কমলাকান্তের জোবানবন্দী
খোশনবীস জুনিয়র প্রণীত

সেই আফিঙ্গখোর কমলাকান্তের অনেক দিন কোন সম্বাদ পাই নাই। অনেক সন্ধান করিয়াছিলাম, অকস্মাৎ সম্প্রতি একদিন তাহাকে ফৌজদারী আদালতে দেখিলাম। দেখি যে, ব্রাহ্মণ এক গাছতলায় বসিয়া, গাছের গুঁড়ি ঠেসান দিয়া, চক্ষু বুজিয়া ডাবায় তামাকু টানিতেছে। মনে করিলাম, আর কিছু না, ব্রাহ্মণ লোভে পড়িয়া কাহার ডিবিয়া হইতে আফিঙ্গ চুরি করিয়াছে–অন্য সামগ্রী কমলাকান্ত চুরি করিবেনা–ইহা নিশ্চিত জানি। নিকটে একজন কালোকোর্ত্তা কনষ্টেবলও দেখিলাম। আমি বড় দাঁড়াইলাম না–কি জানি যদি কমলাকান্ত জামিন হইতে বলে। তফাতে থাকিয়া দেখিতে লাগিলাম যে, কাণ্ডটা কি হয়।

কিছুকাল পরে কমলাকান্তের ডাক হইল। তখন একজন কনষ্টেবল রুল ঘুরাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া এজ্লাসে লইয়া গেল। আমি পিছু পিছু গেলাম। দাঁড়াইয়া, দুই একটি কথা শুনিয়া ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলাম।

এজ্লাসে, প্রথমত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার–পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে–সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদি সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।

কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটরায় পূরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল– "হাস কেন?"

কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল. "বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পূরিলে?"

চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, "তামাসার জায়গা এ নয় -হলফ পড়।"

কমলাকান্ত বলিল, "পড়াও না বাপু।"

একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, "বল আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া..."

কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?

মুহুরি। শুন্‌তে পাও না–"পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে—"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্বনাশ!

হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্বনাশ কি?"

কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি–এ কথাটা বল্‌তে হবে?

হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।

কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম–কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?

হাকিম। এর আর মিথ্যা কথা কি?

কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, "তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?" প্রকাশ্যে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার

চোখের দোষই হউক, আর যাই হউক; কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চসমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন–কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না–তখন কেমন করিয়া বলি–আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে__"

ফরিয়াদীর উকিল চটিলেন–তাঁহার মূল্যবান সময়, যাহা মিনিটে মিনিটে টাকা প্রসব করে, তাহা এই দরিদ্র সাক্ষী নষ্ট করিতেছে। উকীল তখন গরম হইয়া বলিলেন, "সাক্ষী মহাশয়!" Theological Lecture টা ব্রাহ্মসমাজের জন্য রাখিলে ভাল হয় না? এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।"

কমলাকান্ত তাঁহার দিকে ফিরিল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনি বোধ হইতেছে উকীল।"

উকীল । (হাসিয়া) কিসে চিনিলে?

কমলা। বড় সহজে। মোটা চেন আর ময়লা শামলা দেখিয়া। তা মহাশয়! আপনাদের জন্য এ Theological Lecture নয়। আপনারা পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখেন স্বীকার করি–যখন মোয়াক্কেল আসে।

উকীল সরোষে উঠিয়া হাকিমকে বলিলেন, "I ask the protection of the Court against the insults of this witness."

কোর্ট বলিলেন, "O Baboo! the witness is your own witness, and you are at liberty to send him away if you like."

এখন কমলাকান্তকে বিদায় দিলে উকীল বাবুর মোকদ্দমা প্রমাণ হয় না–সুতরাং উকীল বাবু চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। কমলাকান্ত ভাবিলেন, এ হাকিমটা জাতিভ্রষ্ট–পালের মত নয়।

হাকিম গতিক দেখিয়া, মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "ওথের প্রতি সাক্ষীর objection আছে–উহাকে simple affirmation দাও।" তখন মুহুরি কমলাকান্তকে বলিল, "আচ্ছা, ও ছেড়ে দাও–বল, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি–বল ।"

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, সেটা জানিয়া প্রতিজ্ঞাটা করিলে ভাল হয় না?

মুহুরি হাকিমের দিকে চাহিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার! সাক্ষী বড় সেরকশ্ ।"

উকীল বাবু হাঁকিলেন, "Very obstructive."

কমলা। (উকীলের প্রতি) শাদা কাগজে দস্তখত করিয়া লওয়ার প্রথাটা আদালতের বাহিরে চলে জানি–ভিতরেও চলিবে কি?

উকীল । শাদা কাগজে কে তোমার দস্তখত লইতেছে?

কমলা। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে, তাহা না জানিয়া, প্রতিজ্ঞা করা, আর কাগজে কি লেখা হয় তাহা না দেখিয়া, দস্তখত করা, একই কথা।

হাকিম তখন মুহুরিকে আদেশ করিলেন যে, "প্রতিজ্ঞা আগে ইহাকে শুনাইয়া দাও–গোলমালে কাজ নাই ।" মুহুরি তখন বলিল, "শোন, তোমাকে বলিতে হইবে যে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি যে সাক্ষ্য দিব, তাহা সত্য হইবে, আমি কোন কথা গোপন করিব না–সত্য ভিন্ন আর কিছু হইবে না ।"

কমলা। ওঁ মধু মধু মধু।

মুহুরি। সে আবার কি?

কমলা। পড়ান, আমি পড়িতেছি।

কমলাকান্ত তখন আর গোলযোগ না করিয়া প্রতিজ্ঞা পাঠ করিল। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য উকীল বাবু গাত্রোত্থান করিলেন, কমলাকান্তকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিলেন, "এখন আর বদ্‌মায়েশি করিও না-আমি যা জিজ্ঞাসা করি, তার যথার্থ উত্তর দাও। বাজে কথা ছাড়িয়া দাও ।"

কমলা। আপনি যা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাই আমাকে বলিতে হইবে? আর কিছু বলিতে পাইব না?

উকীল । না।

কমলাকান্ত তখন হাকিমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "অথচ আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে, 'কোন কথা গোপন করিব না ।' ধর্ম্মাবতার, বে-আদবি মাফ হয়! পাড়ায় আজ একটা যাত্রা হইবে, শুনিতে যাইব ইচ্ছা ছিল; সে সাধ এইখানেই মিটিল। উকীল বাবু অধিকারী-আমি যাত্রার ছেলে, যা বলাইবেন, কেবল তাই বলিব; যা না বলাইবেন, তা বলিব না। যা না বলাইবেন, তা কাজেই গোপন থাকিবে। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধ লইবেন না ।"

হাকিম। যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিবে, তাহা না জিজ্ঞাসা হইলেও বলিতে পার।

কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব ।" উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, "তোমার নাম কি?"

কমলা। শ্রী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।

উকীল । তোমার বাপের নাম কি?

কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?

উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, "হুজুর! এ সব Contempt of Court." হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন-বলিলেন, "আপনারই সাক্ষী ।" সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, "বল। বলিতে হইবে ।"

কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি জাতি?"

কমলা। আমি কি একটা জাতি?

উকীল । তুমি কোন্ জাতীয়।

কমলা। হিন্দু জাতীয়।

উকীল । আঃ! কোন্ বর্ণ?

কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।

উকীল । দূর হোক ছাই! এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?

কমলা। মারে কে?

হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় হইবে না। বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈয়বর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত-তুমি তার কোন জাতির ভিতর?"

কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলের ধৃষ্টতা! দেখিতেছেন আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী-ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?

হাকিম লিখিলেন, "জাতি ব্রাহ্মণ ।" তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বয়স কত?"

এজ্‌লাসে একটা ক্লক ছিল-তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, "আমার বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস, তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট ___"

উকীল । কি জ্বালা! তোমার ঘণ্টা মিনিট কে চায়?
কমলা। কেন, এইমাত্র প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন যে, কোন কথা গোপন করিব না।
উকীল । তোমার যা ইচ্ছা কর! আমি তোমায় পারি না। তোমার নিবাস কোথা?
কমলা। আমার নিবাস নাই।
উকীল । বলি, বাড়ী কোথা?
কমলা। বাড়ী দূরে থাক, আমার একটা কুঠারীও নাই।
উকীল । তবে থাক কোথা?
কমলা। যেখানে সেখানে।
উকীল । একটা আড্ডা ত আছে?
কমলা। ছিল, যখন নসী বাবু ছিলেন। এখন আর নাই।
উকীল । এখন আছ কোথা?
কমলা। কেন, এই আদালতে।
উকীল । কাল ছিলে কোথা?
কমলা। একখানা দোকানে।
হাকিম বলিলেন, “আর বকাবকিতে কাজ নাই–আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?
উকীল । তোমার পেশা কি?
কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?
উকীল । বলি, খাও কি করিয়া?
কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি।
উকীল । সে ডাল ভাত জোটে কোথা থেকে?
কমলা। ভগবান্ জোটালেই জোটে, নইলে জোটে না।
উকীল । কিছু উপার্জ্জন কর?
কমলা। এক পয়সাও না।
উকীল । তবে কি চুরি কর?
কমলা। তাহা হইলে ইতিপূর্ব্বেই আপনার শরণাগত হইতে হইত। আপনি কিছু ভাগও পাইতেন।
উকীল তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া, আদালতকে বলিলেন, “আমি এ সাক্ষী চাহি না। আমি ইহার জোবানবন্দী করাইতে পারিব না ।”
প্রসন্ন বাদিনী, উকীলের কোমর ধরিল; বলিল, “এ সাক্ষী ছাড়া হইবে না। এ বামন সত্য কথা বলিবে, তাহা আমি জানি–কখনও মিছা বলে না। উহাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে জান না–তাই ও অমন করিতেছে। ও বামনের আবার পেশা কি? ও এর বাড়ী ওর বাড়ী খেয়ে বেড়ায়, ওকে জিজ্ঞাসা করিতেছ, উপার্জ্জন কর! ও কি বলবে?”
উকীল তখন হাকিমকে বলিল, “লিখুন, পেশা ভিক্ষা ।”
এবার কমলাকান্ত রাগিল, “কি? কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভিক্ষোপজীবী? আমি মুক্তকণ্ঠে হলফের উপর বলিতেছি, আমি কখনও কাহারও কাছে এক পয়সা ভিক্ষা চাই না ।”
প্রসন্ন আর থাকিতে পারিল না–সে বলিল, “সে কি ঠাকুর! কখন আফিঙ্গ চেয়ে খাও নাই?”

কমল। দূর মাগি ধেমো গোয়ালার মেয়ে! আফিঙ্গ কি পয়সা! আমি কখন একটি পয়সাও কাহারও কাছে ভিক্ষা লই নাই।
হাকিম হাসিয়া বলিলেন, “কি লিখিব কমলাকান্ত?”
কমলাকান্ত নরম হইয়া বলিল, “লিখুন, পেশা ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ-গ্রহণ” সকলে হাসিল-হাকিম তাই লিখিয়া লইলেন।
তখন উকীল মহাশয় মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি ফরিয়াদীকে চেন?”
কমল। না।
প্রসন্ন হাঁকিল, “সে কি ঠাকুর! চিরটা কাল আমার দুধ দই খেলে, আজ বল চিনি না?”
কমলাকান্ত বলিল, “তোমার দুধ দই চিনি না, এমন কথা ত বল্‌তেছি না-তোমার দুধ দই বিলক্ষণ চিনি। যখনই দেখি এক পোয়া দুধে তিন পোয়া জল, তখনই চিনিতে পারি যে, এ প্রসন্ন গোয়ালিনীর দুধ; যখনই দেখ্‌তে পাই যে, ঘোলের চেয়ে দই ফিকে, তখনই চিনতে পারি যে, এ প্রসন্নময়ীর দুধ। দুধ দই চিনি নে?”
প্রসন্ন নথ ঘুরাইয়া বলিল, “আমার দুধ দই চেন, আর আমায় চিনিতে পার না?”
কমলাকান্ত বলিল, “মেয়েমানুষকে কে কবে চিনিতে পেরেছে, দিদি? বিশেষ, গোয়ালার মেয়ের কাঁকালে যদি দুধের কেঁড়ে থাকিল, তবে কার বাপের সাধ্য তাকে চিনে উঠে?”
উকীল তখন আবার সওয়াল করিতে লাগিলেন, “বুঝা গেল; তুমি বাদিনীকে চেন-উহার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ আছে?”
কমল। মন্দ নয়-এত গুণ না থাকিলে কি উকীল হয়!
উকীল । তুমি আমার কি গুণ দেখিলে?
কমল। বামনের ছেলে গোয়ালার মেয়েতেও আপনি একটা সম্বন্ধ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।
উকীল । এমন সম্বন্ধ কি হয় না? কে জানে তুমি ওর পোষ্যপুত্র কি না?
কমল। ওর নয়, কিন্তু ওর গাইয়ের বটে।
উকীল । বুঝা গেল, তোমার সঙ্গে বাদিনীর একটা সম্বন্ধ আছে, একেবারে সাফ বলিলেই হইত-এত দুঃখ দাও কেন? এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি এ মোকদ্দমার কি জান?
কমল। জানি যে, এ মোকদ্দমায় আপনি উকীল, প্রসন্ন ফরিয়াদী, আমি সাক্ষী আর এই নেড়ে আসামী।
উকীল । তা নয়, গোরুচুরির কি জান?
কমল। গোরুচুরির আমার বাপ-দাদাও জানে না। বিদ্যাটা আমায় শিখাইবেন?-আমার দুধ দধির বড় দরকার।
উকীল । আঃ-বলি গোরুচুরি দেখিয়াছ?
কমল। একদিন দেখিয়াছিলাম। নসী বাবুর একটা বক্‌না-এক বেটা মুচি-
উকীল । কি যন্ত্রণা! বলি, প্রসন্ন গোয়ালিনীর গোরু যখন চুরি যায়, তখন তুমি দেখিয়াছ?
কমল। না-চোর বেটার এত বুদ্ধি হয় নাই যে, আমাকে ডাকিয়া সাক্ষী রাখিয়া গোরুটা চুরি করে। তাহা হইলে আপনারও কাজে সুবিধা হইত, আমারও কাজের সুবিধা হইত।
প্রসন্ন দেখিল, উকীলকে টাকা দেওয়া সার্থক হয় নাই -তখন আপনার হাতে হাল লইবার ইচ্ছায়, উকীলের কাণে কাণে বলিয়া দিল, “ও বামুন সে সব কিচ্ছুর সাক্ষী নয়-ও কেবল গোরু চেনে ।”

উকীল মহাশয় তখন কূল পাইলেন। গর্জ্জিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গোরু চেন?"
কমলাকান্ত মধুর হাসিয়া বলিল, "আহা চিনি বই কি-নহিলে কি আপনার সঙ্গে এত মিষ্টালাপ করি?"
হাকিম দেখিলেন, সাক্ষী বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে-বলিলেন, "ও সব রাখ ।" প্রসন্ন গোয়ালীর শামলা গাই আদালতের সম্মুখে মাঠে বাঁধা ছিল-দেখা যাইতেছিল। ডিপুটি বাবু সেই দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই গোরুটিকে চেন?"
কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, "কোন্ গোরুটি, ধর্ম্মাবতার?"
হাকিম বলিলেন, "কোন্ গোরুটি কি? একটি বই ত সাম্‌নে নাই?"
কমল। আপনি দেখিতেছেন, একটি-আমি দেখিতেছি অনেকগুলি।
হাকিম বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "দেখিতে পাইতেছ না-ঐ শামলা?"
কমলাকান্ত শামলা গাইয়ের দিকে না চাহিয়া উকীলের শামলার প্রতি চাহিল। বলিল, "এ শামলাও চুরির না কি?"
কমলাকান্তের নষ্টামি হাকিম আর সহ্য করিতে পারিলেন না-বলিলেন, "তুমি আদালতের কাজের বড় বিঘ্ন করিতেছ-Contempt of Court জন্য তোমার পাঁচ টাকা জরিমানা ।"
কমলাকান্ত আভূমিপ্রণত সেলাম করিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হুজুর! জরিমানা আদায়ের ভার কার প্রতি?"
হাকিম। কেন?
কমল। কিরূপে আদায় করিবেন, সে বিষয়ে তাঁহাকে কিছু উপদেশ দিব।
হাকিম। উপদেশের প্রয়োজন কি?
কমল। ইহলোকে ত আমার নিকট জরিমানা আদায়ের কোন সম্ভাবনা নাই- তিনি পরলোকে যাইতে প্রস্তুত কি না জিজ্ঞাসা করিব।
হাকিম। জরিমানা না দিতে পার, কয়েদ যাইবে।
ক। কত দিনের জন্য, ধর্ম্মাবতার?
হাকিম। জরিমানা অনাদায়ে এক মাস কয়েদ।
কমল। দুই মাস হয় না?
হাকিম। বেশী মিয়াদের ইচ্ছা কর কেন?
কমল। সময়টা কিছু মন্দ পড়িয়াছে-ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ আর তেমন সুলভ নয়-জেলখানায় যাহাতে মাস দুই ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ হয়, সে ব্যবস্থা যদি আপনি করেন, তবে গরীব ব্রাহ্মণ উদ্ধার পায়।
এরূপ লোককে জরিমানা বা কয়েদ করিয়া কি হইবে? হাকিম হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যদি গোল না করিয়া সোজা জোবানবন্দী দাও, তবে তোমার জরিমানা মাপ করা যাইতে পারে। বল-ঐ গোরু তুমি চেন কি না?"
হাকিম তখন একজন কনষ্টেবলকে আদেশ করিলেন যে গোরুর নিকট গিয়া প্রসন্নের গাই দেখাইয়া দেয়। কনষ্টেবল তাহাই করিল। বিষণ্ণ উকীল বাবু তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ গোরু তুমি চেন?"
কমল। সিংওয়ালা গোরু-তাই বলুন।
উকীল । তুমি বল কি?

কমল। আমি বলি শামলাওয়ালা-তা যাক্-আমি ও সিংওয়ালা গোরুটা চিনি। বিলক্ষণ আলাপ আছে।
উকীল । ও কার গোরু?
কমল। আমার।
উকীল । তোমার!
কমল। আমারই।
হরি হরি! প্রসন্নের মুখ শুকাইল! উকীল দেখিল, মোকদ্দমা ফাঁসিয়া যায়। প্রসন্ন তখন তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তবে রে বিটলে! গোরু তোমার!"
কমলাকান্ত বলিল, "আমার না ত কার! আমি ওর দুধ খেয়েছি, ওর দই খেয়েছি-ওর ঘোল খেয়েছি, ওর ছানা খেয়েছি-ওর মাখন খেয়েছি, ওর ননী খেয়েছি-ও গোরু আমার হলো না, তুই বেটী পালিস্ ব'লে কি তোর বাবার গোরু হলো!"
উকীল অতটা বুঝিলেন না। বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, witness hostile! permission দিন আমি ওকে cross করি ।"
কমল। কি? আমায় cross করিবে?
উকিল। হাঁ করিব।
কমল। নৌকায়, না সাঁকো বেঁধে?
উকিল। সে আবার কি?
কমল। বাবা! কমলাকান্ত-সাগর পার হও, এত বড় হনূমান্ তুমি আজও হও নাই।
এই বলিয়া কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী রাগে গর্ গর্ করিয়া কাটরা হইতে নামিয়া যায়-চাপরাশী ধরিয়া আবার কাটরায় পূরিল। তখন কমলাকান্ত আলু থালু হইয়া নিশ্চেষ্ট হইল-বলিল, "কর বাবা ক্রস্ কর!-আমি অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া আছি-যে ইচ্ছা লম্ফ দাও-'অপামিবাধারমনুত্তরঙ্গং!-উকিল মহাশয়! এ প্রশান্ত মহাসমুদ্র তরঙ্গ বিক্ষেপ করে না আপনি স্বচ্ছন্দে উল্লম্ফন করুন ।"
উকীল তখন কোর্টকে বলিলেন, "ধর্ম্মাবতার, দেখা যাইতেছে যে, এ ব্যক্তি বাতুল; ইহাকে আর ক্রস্ করিবার প্রয়োজন নাই। বাতুল বলিয়া ইহার জবানবন্দী পরিত্যক্ত হইবে। ইহাকে বিদায় দেওয়া হউক ।"
হাকিম কমলাকান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলে বাঁচেন, বিদায় দিতে প্রস্তুত, এমত সময়ে প্রসন্ন হাত যোড় করিয়া আদালতে নিবেদন করিল, "যদি হুকুম হয়, তবে আমি স্বয়ং উহাকে গোটা কত কথা জিজ্ঞাসা করি, তার পর বিদায় দিতে হয়, দিবেন ।"
হাকিম কৌতূহলী হইয়া অনুমতি দিলেন। প্রসন্ন তখন কমলাকান্তের প্রতি চাহিয়া বলিল, "ঠাকুর! মৌতাতের সময় হয়েছে না?"
কমল। মৌতাতের আবার সময় কি রে বেটী -"অজরামরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিদ্যাং নেশচাঞ্চ চিন্তয়েৎ ।"
প্রসন্ন । অং বং এখন রাখ -এখন মৌতাত করিবে?
কমল। দে!
প্রসন্ন । আচ্ছা, আগে আমার কথার উত্তর দাও -তার পর সে হবে।
কমল। তবে জল্দি জল্দি বল - জল্দি জল্দি জবাব দিই।
প্রসন্ন । বলি, গোরু কার?

কমল। গোরু তিন জনের; গোরু প্রথমে বয়সে গুরুমহাশয়ের; মধ্যবয়সের স্ত্রীজাতির; শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর; দড়ি ছিঁড়িবার সময়ে কারও নয়।
প্রসন্ন । বলি, ঐ শামলা গাই কার?
কমল। যে ওর দুধ খায় তার।
প্রসন্ন । ও গোরু আমার কি না?
কমল। তুই বেটী কখন ওর এক বিন্দু দুধ খেলি নে, কেবল বেচে মর্‌লি, গোরু তোর হলো? ও গোরু যদি তোর হয়, তবে বাঙ্গাল বেঙ্কের টাকাও আমার। দে বেটী, গোরুচোরকে ছেড়ে দে-গরীবের ছেলে দুধ খেয়ে বাঁচুক।
হাকিম দেখিলেন, দুই জনে বড় বাড়াবাড়ি করিতেছে-আদালত মেছো-হাটা হইয়া উঠিল। তখন উভয়কে ধমক দিয়া জিজ্ঞাসাবাদ নিজহস্তে লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রসন্ন এই গোরুর দুধ বেচে?"
কমল। আজ্ঞে, হাঁ।
"উহার গোহালে এই গোরু থাকে?"
কমল। ও গোরুও থাকে, আমিও কখন কখন থাকি।
"ওই খাওয়ায়?"
কমল। উভয়কে।
বাদিনীর উকীল তখন বলিলেন, "আমার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে-আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই না"। এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। তখন আসামীর উকীল গাত্রোত্থান করিলেন। দেখিয়া কমলাকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার তুমি কে?"
আসামীর উকীল বলিলেন, "আমি আসামীর পক্ষে তোমাকে ক্রস্‌ করিব"।
কমল। একজন ত ক্রস্‌ করিয়া গেল, আবার তুমি কুমার বাহাদুর এলে না কি?
উকীল । কুমার বাহাদুর কে?
কমল। রাজপুত্রকে চেন না? ত্রেতা যুগে আগে ক্রস্‌ করিলেন, পবনাঙ্গজ মহাশয়। তার পর ক্রস্‌ করিলেন, কুমার বাহাদুর।20
উকীল । ও সব রাখ-তুমি গোরু চেন বলেছ-কিসে চেন?
কমল। কখন শিঙ্গে-কখন শামলায়!
উকীল রাগিয়া উঠিয়া, গর্জ্জন করিয়া টেবিল চাপড়াইয়া বলিলেন, "তোমার পাগলামি রাখ-তুমি এই গোরু চিনিতে পারিতেছ কিসে?"
কমল। ঐ হাম্বা-রবে।
উকীল হতাশ হইয়া বলেন, "Hopeless" উকীল মহাশয় বসিয়া পড়িলেন-আর জেরা করিবেন না। কমলাকান্ত বিনীতভাবে বলিল, "দড়ি ছেঁড় কেন বাবা?"
উকীল আর জেরা করিবেন না দেখিয়া হাকিম কমলাকান্তকে বিদায় দিলেন। কমলাকান্ত উর্দ্ধশ্বাসে পলাইল। আমি কিছু কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম যে, কমলাকান্ত থেলো হুঁকা হাতে করিয়া বসিয়া আছে-চারি দিকে লোক জমিয়াছে-প্রসন্নও সেখানে আসিয়াছে। কমলাকান্ত তাহাকে তিরস্কার করিতেছে আর বলিতেছে, "তোর মঙ্গলার বাঁটের দিব্য, তোর দুধের কেঁড়ের দিব্য, তোর ঘোলমউনির

দিব্য, তোর ফাঁদি–নথের দিব্য, তুই যদি চোরকে গোরু ছেড়ে না দিস্!”
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “চক্রবর্ত্তী মহাশয়! চোরকে গোরু ছাড়িয়া দিবে কেন?”
কমলাকান্ত বলিল, “পূর্ব্বকালে মহারাজ শ্যেনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, ‘বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর, ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধ পান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।[21] এই হলো ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই ইউরোপের International Law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ, আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইনমতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও ।”
এই বলিয়া কমলাকান্ত সেখান হইতে চলিয়া গেল। দেখিলাম, মানুষটা নিতান্ত ক্ষেপিয়া গিয়াছে।

খোশনবীস্ জুনিয়র।

————————————-

20 অঙ্গদ।

21 শান্তিপর্ব্ব, ১৭৪ অধ্যায়।

Bironjeet Roy